Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না তুলি

রোলঃ 23090120282

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না তুলি

রোলঃ 23090120282

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তামান্না তুলি, আইডিঃ 23090120282 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Tamanna

(স্বাক্ষর)

তামান্না তুলি

আইডিঃ 23090120282

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ঈমান (ايمان) পরিচিতি **6**

ঈমানের আভিধানিক অর্থ : 6

ঈমানের পারিভাষিক অর্থ : 6

ঈমান কী? 7

মুমিন কারা? 8

ঈমানের শাখা-প্রশাখা : 9

ঈমান ও আমলের সম্পর্ক **13**

ঈমান ও আকীদার সম্পর্ক **16**

আকীদার পরিচয় : 16

আকীদার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: 17

বিশুদ্ধ আকীদা ও ঈমানের গুরুত্ব : 18

ঈমানের স্বরূপ ও বাস্তবতা **20**

ঈমানের শর্তাবলী **25**

ঈমানের রুকনসমূহ **27**

ঈমান কম-বেশি হয় নাকি একই অবস্থায় থাকে? **29**

ঈমান কীভাবে বাড়ে ও কমে **31**

ঈমান ও কুফর **32**

কুফর কী? 32

কুফরের প্রকারভেদ : 32

কুফরের পরিণতি : 33

ঈমান ও শিরক **36**

শিরক কী? 36

শিরকের প্রকারভেদ : 37

শিরকের ভয়াবহতা : 40
ভয়ঙ্করতম পাপ 41
কুফর-শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না 41
শিরক-কুফর সকল নেক কর্ম ধ্বংস করে 42
শিরক-কুফর জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ 42
ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ 43
ঈমান এবং ইসলামের মধ্যে পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক 48
ঈমানের দৃষ্টিতে মুমিনের মর্যাদা 53
ঈমান ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না 54
ঈমানদার গুনাহগার হলে জান্নাত লাভ করবে কি? 55
ঈমান সংরক্ষণের উপায় 57
পরিসমাপ্তি 60

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা প্রাণী মানুষ ও মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ জাতি মুসলমান হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে ঈমানের মতো মহাদৌলত দান করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর।

ইসলামের মূল ভিত্তি হলো ঈমান ও আকীদা। ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস আর আকীদা হলো সেই বিশ্বাসের সুসংহত রূপ। একজন মুসলিমের জীবন ও আমল এই ঈমানের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।ঈমান ছাড়া মানুষ ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না। ঈমান হলো সকল ইবাদত ও সৎকর্মের ভিত্তি। যদি কারো অন্তরে ঈমান না থাকে, তবে তার নামাজ, রোজা, দান-সদকা—কোন আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

ঈমানহীন ব্যক্তি আখিরাতে মুক্তি লাভ করতে পারে না, বরং পরকালীন শাস্তির মুখোমুখি হয়। পৃথিবীতেও ঈমানহীন জীবনে থাকে অনিশ্চয়তা, অশান্তি ও ভয়ের ছায়া, কারণ ঈমান মানুষকে আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য ও নৈতিক শক্তি প্রদান করে।আল্লাহ তা'য়ালা সূরা মায়িদার ৫ নং আয়াতে বলেন -

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

"আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম বিনষ্ট বা নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [1]

এজন্য কুরআন ও হাদিসের আলোকে ঈমানের সঠিক ধারণা এবং এর বিস্তারিত দিকগুলো বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

[1] সূরা মায়িদা : ০৫

ঈমান (ايمان) পরিচিতি

ঈমানের আভিধানিক অর্থ :

ঈমান (اَلْإِيْمَان) শব্দটি আরবি। এটা আমনুন (أَمْن) শব্দ থেকে গঠিত।ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিশ্বাস করা,আস্থা স্থাপন,স্বীকার করা, ভরসা করা, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি। শব্দটির অর্থ সম্পর্কে চতুর্থ হিজরি শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস [৩৯৫ হি.] বলেন : "হামজা, মিম ও নূন এই ধাতুটির মূল অর্থ দুটি- প্রথম অর্থ বিশ্বস্ততা, যা খিয়ানতের বিপরীত এবং দ্বিতীয় অর্থ বিশ্বাস করা বা কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করা।আমরা দেখছি যে, অর্থ দুটি খুবই নিকটবর্তী ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।"
তিনি উভয় অর্থে ঈমান শব্দের অর্থ আলোচনা করে উল্লেখ করেন যে, প্রথম অর্থে ঈমান অর্থ নিরাপত্তা প্রদান করা বা আমানতদার বলে মনে করা। আর দ্বিতীয় অর্থে ঈমান অর্থ বিশ্বাস করা,বিশ্বস্ততায় আস্থা স্থাপন করা।

ঈমানের পারিভাষিক অর্থ :

শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলা হয় রাসুল সাঃ কর্তৃক আনীত ঐ সকল বিষয় যা স্পষ্টভাবে এবং অবধারিতরূপে প্রমাণিত, সে সমুদয়কে রাসুল (সা.)-এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে বিশ্বাস করা এবং মুখে তা স্বীকার করা (যদি স্বীকার করতে বলা হয়) ও মেনে নেয়া।
ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে ইসলামী পন্ডিতগণ যা বলেছেন-

- আবু হানিফা (র.)-এর মতে, শুধু মনে প্রাণে বিশ্বাসের নামই ঈমান।মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের জন্য শর্ত।আর বিশ্বাস অনুযায়ী আমল ঈমানের পরিপূর্ণতা দান করে।
- ইমাম গাযালী (র.)-এর মতে, রাসূল (সা.) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবগুলোর প্রতি আস্থা স্থাপনপূর্বক তা বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়।
- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে, সমস্ত আদিষ্ট বিষয়ে আমল করা এবং সকল নিষিদ্ধ বিষয় ত্যাগ করার নামই ঈমান।
- উমদাতুল কারী গ্রন্থকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.)-এর মতে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলো সব মেনে নেওয়ার মানই হলো

ঈমান।সংক্ষেপে বলা যায়, শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে নেওয়ার নামই হল ঈমান ।

মোটকথা শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা মৌলিক ঈমান। আর শরীয়তের বিধান তার উপর আরোপের জন্য ও বাহ্যিক পরিচয়ের জন্য মৌখিক স্বীকৃতি প্রধান একান্ত প্রয়োজন এবং বাস্তব জীবনে তা আমল করা পূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক। যিনি এরূপ পূর্ণ ঈমানের অধিকারী তিনি হলেন পূর্ণ মুমিন বা মুমিনে কামিল।

আর শরীয়তের বিধি-বিধান সামগ্রিক জীবন যাপনে বাস্তবায়নে কোন ত্রুটি থাকলে তিনি মুমিনে নাকিস বা মুমিনে ফাসিক (গুনাহগার মুমিন) হিসেবে পরিচিত হবেন।আমলে ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন এবং তাওবা করতে হবে। অন্যথায় অপরাধী হিসেবে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ঈমান কী?

সহজভাষায়, ঈমান মানে হচ্ছে আল্লাহ তা''য়ালার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, তাঁর নির্দেশ মেনে চলা, তাঁর প্রেরিত সব বিষয়ে আন্তরিকভাবে আস্থা রাখা এবং তা মুখে ও কাজে প্রকাশ করা। ইসলামি পরিভাষায়, ঈমান হলো হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখা, মুখে তা স্বীকার করা এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তার প্রমাণ দেওয়া।

সংক্ষেপে ও সাধারন কথায়, ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন—

وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ

“যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য এমন সব বাগান (প্রস্তুত) রয়েছে, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে।” [2]

[2]সূরা বাকারা : ২৫

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ঈমান হলো ৭০-এরও বেশি শাখা; সর্বোচ্চ হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।" [3]

মুমিন কারা?

মুমিন একটি আরবি শব্দ, যা মূলত আরবি ঈমান শব্দ থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ বিশ্বাসী এবং এর দ্বারা একজন কঠোরভাবে অনুগত মুসলিমকে বুঝায়, যে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ইসলামকে নিজের অভ্যন্তরের এবং বাহিরের সকল কর্মকাণ্ডে ধারণ করে এবং আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। নারীদের ক্ষেত্রে মুমিনা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপে, যার মধ্যে ঈমান আছে তাকে মুমিন বলা হয়।

কুরআন ও হাদিসে প্রকৃত মুমিনের পরিচয় ও সফল মুমিনের গুণাবলী নিয়ে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তা সংক্ষেপে বর্ণনা দেয়া হলো :

ঈমান, ইয়াকিন, ইখলাস, তাকওয়া, তাজকিয়া ও ইহসান অর্জনের মাধ্যমে ইসলাম বা আত্মসমর্পণ সফল মুমিনের গুনাবলী।আল কোরআনের শুরুতেই বিবৃত হয়েছে, 'আলিফ লাম মিম'!এই সেই মহাগ্রন্থ, যাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, এটি মুত্তাকিনদের জন্য পথনির্দেশ। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদের যে রিজিক-দৌলত দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে।আর যারা বিশ্বাস করে তারা আপনার প্রতি, অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি আর যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে এবং তারা আখিরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এরা এদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের ওপরে রয়েছে এবং এরাই সফলকাম।' [4]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআন মাজিদে তার প্রিয় বান্দাদের পরিচয় উল্লেখ করে বলেন,"দয়াময় আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে তাদের যখন অজ্ঞ লোক মূর্খতাসুলভ সম্বোধন করে তখনো তারা সালাম ও শান্তির বাণী বলে। তারা রাত্রি যাপন করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সেজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে এবং তারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের

[3] সহিহ মুসলিম

[4] সূরা বাকারা : ১-৫

শাস্তি বিদূরিত করুন; উহার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ! নিশ্চয়ই তা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসেবে নিকৃষ্ট!" আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না ; বরং মধ্যপন্থায় থাকে। তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ বা মাবুদকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না।যে ব্যক্তি এরূপ করবে তাকে তার গুনাহের (শাস্তির) সম্মুখীন হতে হবে।" [5]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "মুমিন তো তারাই, যখন তাদের সামনে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তখন তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দেয়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।" [6]

ঈমানের শাখা-প্রশাখা :

ঈমানের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.)-র বর্ণনায় আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "ঈমানের শাখা-প্রশাখা ৭০টির বেশি অথবা ৬০টির বেশি। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি বা তাওহীদের ঘোষণা দেয়া। সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ঈমানের অন্যতম একটি শাখা।"

উল্লেখিত হাদিসের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, ঈমানের শাখা-প্রশাখা নানামুখি।বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে হিব্বান (রহ.) মোট ৭৯ টি শাখার কথা উল্লেখ করেছেন।

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবদুল জলিল আল-কসরি (র.) 'শুআবুল ঈমান' বইটিতে ৭৪টি, হাফেজ আবু আবদিল্লাহ আল-হালিমি (র.) 'আল-মিনহাজ ফি শুআবিল ঈমান' বইয়ে ৭৭টি এবং ইমাম আবু বকর বাইহাকি (র.) 'জামিউল মুছান্নাফ ফি শুআবিল ঈমান' বইয়ে ঈমানের ৭৭টি শাখা-প্রশাখার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা তুলে ধরেছেন।

এছাড়া আব্দুস সালাম ইয়াসীন 'শুআবুল ঈমান' বইয়ে ঈমানের ৭৭ টি শাখা-প্রশাখাকে ১০টি শ্রেনীতে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করেছেন।ঈমানের ৭৭ টি শাখা-প্রশাখা তিন ভাগে বিভক্ত।এর

[5] সূরা ফরকান : ৬৩-৬৮

[6] সূরা আনফাল : ২

মধ্যে ৩০টি রয়েছে বিশ্বাস বা অন্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ৭টি শাখা প্রকাশ্য বা জবানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ৪০ টি শাখা রয়েছে কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত। নিচে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো ।

অন্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঈমানের ৩০টি বিষয় -

১.আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস।

২.আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু তাঁরই সৃষ্টি এই বিশ্বাস।

৩.ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস।

৪.আসমানী কিতাব সমূহে বিশ্বাস।

৫.সব নবী-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস।

৬.তাকদিরের ওপর বিশ্বাস।

৭.কেয়ামত ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস।

৮.জান্নাত বা বেহেশতের প্রতি বিশ্বাস।

৯.জাহান্নাম বা দোজখের প্রতি বিশ্বাস।

১০.আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও মহব্বত।

১১.আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের প্রতি ভালোবাসা।

১২.মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করা।

১৩.সব কাজে রাসুল (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণ করা।

১৪.যেকোনো কাজ ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা।

১৫.রিয়া (আত্মপ্রদর্শন) ও মুনাফিকি পরিত্যাগ করা।

১৬.সর্বক্ষণ অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখা।

১৭.আল্লাহর রহমতের আশা রাখা।

১৮.কখনো কোন গুনাহের কাজ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তাওবা করা।

১৯.কথায় ও কাজে সর্বদা আল্লাহর নেয়ামত সমূহের কৃতজ্ঞতা আদায় করা।

২০.বৈধ ওয়াদা পালন করা।

২১.কাম রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করা।

২২.বিপদে ধৈর্যধারণ করা।

২৩.আল্লাহ যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকা।

২৪.বিনয়ী হওয়া।

২৫.বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা।

২৬.গর্ব ও অহংকার পরিত্যাগ করা।

২৭.হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করা।

২৮.রাগ-ক্রোধ দমন করা, কারো সঙ্গে মনোমালিন্য না রাখা।

২৯.দুনিয়ার (ধন-সম্পদের) মহব্বত না রাখা।

৩০.লজ্জা থাকা।

জবানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঈমানের ৭টি বিষয় -

১. আল্লাহর একত্ব মুখে স্বীকার করা।

২. কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।

৩. দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা।

৪. দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া ও দ্বীনের প্রচার করা।

৫. দোয়া করা (নিজের ও অন্যের কল্যাণ কামনা করা)।

৬. জিকির করা (আল্লাহর গুণাবলী আলোচনা করা)।

৭. বাহুল্য কথাবার্তা বলা ও শোনা থেকে বিরত থাকা।

কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত ঈমানের ৪০টি বিষয় -

১. পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।

২. সতর ঢাকা।

৩. নামাজ পড়া।

৪. যাকাত-ফিতর ও সদকায়ে ফিতর (এবং দান দক্ষিণা) প্রদান করা।

৫. দাস-দাসীকে মুক্তি দেওয়া।

৬. দানশীল বা উদার মনের অধিকারী হওয়া।

৭. কুরআন-হাদিস-ফিকাহ শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৮. রোজা রাখা। রমজানের শেষ ১০ দিন ইতেকাফ করা ও শবে কদর তালাশ করা।

৯. হজ্ব করা।

১০. হিজরত করা। যে দেশে বা সমাজে থেকে দিন-ঈমান রক্ষা করা যায় না, সেই দেশ বা সমাজ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া বা পরিবর্তনের চেষ্টা করা।

১১. আল্লাহর ওয়াস্তে মানত করলে তা পূর্ণ করা।

১২.আল্লাহর নামে কোনো জায়েজ কাজে কসম করলে তা পূর্ণ করা।

১৩. আল্লাহর নামে কসম করে তা ভঙ্গ করলে তার কাফফারা আদায় করা (নাজায়েজ কাজের কসম করলেও তা ভঙ্গ করে কাফফারা আদায় করা)।

১৪. কাম রিপু প্রবল হলে বিবাহ করা।

১৫. স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, পরিবার-পরিজন ও অধীনস্তদের হক আদায় করা।

১৬. সন্তান প্রতিপালন করা এবং তাদের দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া।

১৭. আত্নীয়-স্বজনের হক প্রদান করা এবং তাদের সঙ্গে সদাচার করা।

১৮. আল্লাহর হুকুমে বিপরীত নয়- এমন সব বিষয়ে মনিবের বা মালিকের অনুগত থাকা।
১৯. জায়েজ ও হালাল বিষয়ে ওস্তাদ, পীর, মুরব্বিদের অনুগত থাকা।
২০. মা-বাবার সঙ্গে সদাচার করা।
২১. চাকর, কর্মচারী ও অধীনস্তদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা।
২২. নেতৃবৃন্দ ও দায়িত্বশীলদের ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু হওয়া।
২৩. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত থাকা।
২৪. পরোপকার ও মানবকল্যাণে নিয়োজিত থাকা।
২৫. দায়িত্বশীলদের বৈধ নির্দেশ পালন করা।
২৬. সৎকাজে সহযোগিতা করা ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করা।
২৭. অধীনস্তদের শরিয়তসম্মত ভাবে পরিচালনা করা।
২৮. রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা করা।
২৯. আমানত রক্ষা করা (মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত আমানত)।
৩০. অভাবগ্রস্থকে কর্জে হাসানা (লাভবিহীন ঋণ) দিয়ে সাহায্য করা।
৩১. ঋণ পরিশোধ করা এবং পরিশোধের পূর্বে তা পরিশোধ করার দৃঢ় ইচ্ছা রাখা।
৩২. পাড়া-প্রতিবেশীর উপকার করা এবং তারা কোনো ধরনের কষ্ট দিলে বা ক্ষতি করলে তা অম্লান বদনে সহ্য করা।
৩৩. কাজ-কারবার, লেনদেন পরিষ্কার রাখা, পাওনা আদায় করতে কঠোরতা ও দেনা পরিশোধ করতে শিথিলতা না করা।
৩৪. মাপে কম না দেওয়া, পণ্যে ভেজাল না দেওয়া।
৩৫. সুদ-ঘুষ ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা।
৩৬. সম্পদের সদ্ব্যবহার (বৈধভাবে উপার্জন ও জায়েজ পন্থায় ব্যয়) করা।
৩৭. সালামের জবাব দেওয়া এবং হাঁচির উত্তর দেওয়া (দোয়া পড়া)।
৩৮. অবৈধ খেলাধুলা, রং-তামাশা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা।
৩৯. ঈদের নামাজ আদায় করা ও কোরবানি করা।
৪০. রাস্তায় কষ্টদায়ক কোনো কিছু থাকলে তা অপসারণ করা।

ঈমানের শাখা-প্রশাখাগুলো মর্যাদাগত বিবেচনায় প্রত্যেকটি সমান নয়। আবার কোনোটি সস্তাও নয়। বরং প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখা মুসলমানের জন্য মহামূল্যবান সম্পদ।ঈমানের সব শাখা-প্রশাখা যে মুমিন-মুসলমানের মধ্যে পাওয়া যাবে, তিনি কামিল মুমিন।আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ঈমানের প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখা ধারণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

ঈমান ও আমলের সম্পর্ক

ঈমান ও আমলের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে ঈমান হলো বিশ্বাস এবং আমল হলো সেই বিশ্বাসের বাস্তবায়ন। ঈমান ছাড়া আমল মূল্যহীন, আবার ঈমানের প্রমাণও আসে ভালো কাজের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বারবার উল্লেখ করেছেন যে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম (আমলে সালেহ) করেছে, তারাই জান্নাতের অধিকারী হবে।
মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো খাঁটি মনে আল্লাহ তা'য়ালার উপর ঈমান আনা। অর্থাৎ ইসলামকে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন হিসেবে দৃঢ়ভাবে অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও কাজের মাধ্যমে আমলে পরিণত করার নামই প্রকৃত ঈমান গ্রহণের বাস্তব নমুনা। সূরা ইমরানের ১৯নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার কাছে মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম।”

আবার সূরা মায়েদার ৩নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- “আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে (ইসলামকে) পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করেদিলাম এবং ইসলামকে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করলাম।”
অত্র আয়াতদ্বয় দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তায়ালার কাছে পছন্দনীয় দ্বীন হলো ইসলাম। আর ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে, আল্লাহকে একমাত্র রব হিসাবে মেনে নিয়ে মুমিনের প্রধান দায়িত্ব হলো আল্লাহ তায়ালার দেওয়া তদীয় রাসুলের শেখানো পদ্ধতিতে ইসলামের বিধি-বিধান ব্যক্তিজীবনে আমল করার মাধ্যমে খাঁটি মনে ইবাদাত বন্দেগী বাস্তবায়ন করা। ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে মুমিনের প্রধান দায়িত্ব হলো ইসলামের বিধি-নিষেধ গুলো আমল করা এবং যথাযথভাবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইবাদাত গুলো একানিষ্টভাবে আদায় করা। ইবাদাত করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যেমন সূরা যারিয়াতের ৫৬নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন-

“আর আমি মানুষ এবং জ্বীনকে শুধুমাত্র আমার ইবাদাত তথা দাসত্ব ও গোলামী করার জন্য সৃষ্টি করেছি।”

সুতরাং ঈমান গ্রহণ করার পর মুমিনের প্রধান কর্তব্য হলো আল্লাহর ইবাদাত করা। ইবাদাত করা ছাড়া আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনা বৃথা ও অর্থহীন। আমলে সালেহ গুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত হলো সঠিক সময়ে সালাত তথা নামাজ। সূরা বাকারার ০৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

"যারা অদৃশ্য বিষয় (আল্লাহ, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেসতামন্ডলী, পুলসিরাত, মিযান, হাশর ইত্যাদি ঈমানের আনুষঙ্গিক বিষয়) গুলোর উপর না দেখে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সালাত তথা নামাজ কায়েম করেছে এবং আমি তাঁদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করেছে।"

এ আয়াতে ঈমান গ্রহণের পরেই আল্লাহ তায়ালা নামাজ কায়েম করার তাগিদ প্রদান করছেন। আমরা প্রত্যেক মুমিন আল্লাহ তায়ালার গোলাম তার একটি উৎকৃষ্ট নমুনা হলো সালাতে সিজদার মাধ্যমে রবের সামনে উপস্থিত হয়ে আমরা মাথা নত করি। আমলে সালেহ কারীদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। যেমন- পবিত্র কুরআনে এসেছে-

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

"হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ তথা (নেক আমল বা সৎকর্ম) করেছে আপনি তাঁদের এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যে জান্নাতের পাদদেশে নহরসমুহ প্রবাহিত থাকবে।" [7]

শুধু তাই নয় আমলে সালেহকারী মুমিন চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে। যেমন আল কুরআনে এসেছে-

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ তথা নেক আমল করেছে,তারাই জান্নাতের অধিবাসি। তাঁরা সেখানে চিরকাল থাকবে।" [8]

সুরা কাহাফের ৩০-৩১নং আয়াতেও আল্লাহ তায়ালা একই কথা উল্লেখ করেছেন-"যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ তথা সৎ কর্ম সম্পাদন করেছে। আমি আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করিনা।উদাহরণ সরূপ বলা যায় যে, একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব যেমন (পজেটিভ ও নেগেটিভ) দুটির সমন্বয়ে তার কিরণ উদ্ভাসিত করে ঠিক একইভাবে একজন মুমিন আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনলো কিন্তু আমলে সালেহ তথা সৎকর্ম করলো না। একটি বাল্ব

[7] সূরা বাকারা: ২৫

[8] সূরা বাকারা: ৮২

যেমন শুধু তার পজেটিব তার দিয়ে আলো দিতে পারে না।শুধু আল্লাহর উপর ঈমান গ্রহণ কারীর অবস্থা ঐ একতার ওয়ালা বাল্বের মতো হবে। দুনিয়ার দৃষ্টান্তে একটি বাল্বের আলোর জন্য যেমন পজেটিভ ও নেগেটিভ দুটির যৌথ সমন্বয় শর্ত। তদ্রুপভাবে জান্নাতের সুসংবাদের জন্য আল্লাহর তায়ালার উপর ঈমান ও আমলে সালেহ দুটির যৌথ সমন্বয় শর্ত। সূরা আসরেও আল্লাহ তায়ালা একই কথা বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-"আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

"সময়ের কসম। নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্থের মধ্যে। *তবে যারা ঈমান এনেছে, *আমলে সালেহ করেছে, *হক্কের পথে অবিচল থেকেছে এবং *(বিপদে-মুসিবতে) ধৈর্য্য ধারণ করেছে।" [9]

এভাবে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অসংখ্য জায়গায় তাঁর বান্দাহকে ঈমান আনার সাথে সাথে আমলে সালেহ করার তাগিদ প্রদান করেছেন। ঈমান এবং একই সাথে যারা আমলে সালেহ তথা সৎ কর্মের সমন্বয় সাধন করবে, আল্লাহ তাঁদেরকে দুনিয়াতে শাসন কর্তৃত্ব দান করার ওয়াদা করেছেন। আমলে সালেহ বা নেক আমলের ফযিলত: নেক আমলকারীর মর্যাদার বিষয়ে সহীহ মুসলিম শরীফে ঠিক এভাবে বর্ণিত হয়েছে-"বিশিষ্ট হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

"তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উত্তমরুপে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন সে যে আমলে সালেহ বা নেক আমল করে তার প্রত্যেকটি বিনিময়ে সাতশ গুন পর্যন্ত (পূণ্য) লেখা হয়।" [10]

উপরিউল্লিখিত কুরআন-হাদিসের বর্ণনার আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আল্লাহর উপর ঈমান আনার সাথে সাথে নেক আমল করা বান্দার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। আর ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার প্রতিশ্রুতি কুরআনের শতশত জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দিয়েছেন। হে আল্লাহ! আমাদের সকল মুমিন বান্দাহকে বেশি বেশি নেক আমল করার তাওফীক দান করুন, (আমিন)।

[9] সূরা আসর: ১-৩

[10] সহীহ বুখারী, হাঃ নং-৪২, সহীহ মুসলিম, হাঃ নং-১/৫৯, মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং-৮২২৪)

ঈমান ও আকীদার সম্পর্ক

আকীদার পরিচয় :

আকীদা শব্দটি "আকদুন" মূলধাতু থেকে গৃহীত। এর অর্থ হলো বন্ধন করা,গিরা দেওয়া,চুক্তি করা, শক্ত হওয়া ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় আকিদা অর্থ দৃঢ় ও মজবুত ঈমান,অকাট্য প্রমাণ ভিত্তিক খবরাখবর ও বিষয়াবলীর প্রতি মনের অটল বিশ্বাস। আকীদা শব্দের বহুবচন আকাইদ। এ'তেকাদ শব্দটিও এই ব্যবহৃত হয় আকীদা।
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আকীদার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন–

العقائد هي الخصـال التي أخذ الناس و يقيم عليها

অর্থাৎ আকীদা মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে বলা হয় যা তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে এবং তার উপর জান-প্রাণ দিতে অটল থাকে। [11]

আধুনিক ভাষাবিদ ড. ইব্রাহিম আনিস ও তার সঙ্গীগণ সম্পাদিত 'আল মুজামুল ওয়াসিত' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدي معتقده

"আকীদা অর্থ এমন বিধান বা নির্দেশ যা বিশ্বাস অনুসারে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ রাখে না।" [12]

৮ম শতকের প্রসিদ্ধ অভিধানববেত্তা আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ আল ফাইঊমী (৭৭০ হি) তাঁর আল-মিসবাহুল মুনীর গ্রন্থে লিখেছেন :

العقيدة ما يدين الإنسان به و له عقيدة حسنة سالمة

"মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে তাকে 'আকীদা' বলা হয়। (বলা হয়ে থাকে) যার ভালো আকীদা আছে, অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে।"

---

[11] আকীদাতুত ত্বহাবী বাংলা, পৃ:৫

[12] আল মুজামুল ওয়াসিত, ২/৬/১৪)

সামগ্রিক অর্থে আকীদা হলো, ইসলামের যেসকল ভিত্তি কিতাব, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমত দ্বারা নির্দেশিত তা নির্দ্বিধায় অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং বিনা বাক্যে মেনে নেওয়া এবং এক্ষেত্রে অন্তরে কোনো ধরনের কপটতার স্থান না দেওয়া। সে সকল বিষয় হলো : আল্লাহ, ফেরেশতা, তাঁর কিতাব,
তাঁর রসূল, কেয়ামত, তাকদিরের ভালো ও মন্দে বিশ্বাস করা এবং কুরআনে যা কিছু এসেছে তার সমস্ত কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সেই সাথে নবি (সা.) যা কিছু আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন তা বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া। এছাড়াও অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর একত্ববাদ এবং মহত্ত্ব, তার নির্দেশিত পথে উপাসনা করা, কুফরি বাতিল বা অসত্য হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, ইসলামে অবিশ্বাসী
ও আল্লাহর সাথে অপরকে শরিককারী সকলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়া, তাঁকে দেখা ও হাশরের মাঠে তাঁর পুরস্কার ও পরিণতির প্রতি বিশ্বাস রাখাও আকিদার অন্তর্ভুক্ত।

আকীদার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

ইসলামের সকল বিধান ও কর্মের মধ্যে যেমন ঈমানের গুরুত্ব বেশি, তেমনিভাবে সকল ইসলামী ইলম বা জ্ঞানের মধ্যে ঈমান বা আকিদা বিষয়ক জ্ঞানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ইসলামী আকিদার পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি জানতে পারি :
(১) বিশুদ্ধ ঈমানের পরিচিতি ও স্বরূপ ।
(২) ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি, সেগুলির কারণ ও স্বরূপ।
(৩) বিভ্রান্তিকর আকিদাসমূহ, সেগুলির কারণ ও স্বরূপ।

মূলত একজন মুমিনের জন্য এ বিষয়গুলি বিষদভাবে অবগত হওয়া তার দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি ও সফলতার জন্য অপরিহার্য।
ইসলামী জীবন দর্শনে বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত ব্যাপক ও অপরিহার্য। এ বিষয়টি পার্থিব ও পারলৌকিক সম্পর্কিত সকল বিষয়ে সুদৃঢ় ও মজবুত দিক নির্দেশনা প্রদান করে। মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনে যেসব ইবাদত (নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি) করা হয় সব কিছু কবুলের জন্য বিশুদ্ধ আকিদা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً-ً

“যে কোন নর-নারী সৎ কাজ করবে ঈমানদার অবস্থায় অবশ্যই আমি (আল্লাহ্) তাকে পবিত্র উন্নত সমৃদ্ধ জীবন দান করব।”[13]

এ আয়াতে নেক আমল কবুলের জন্য ঈমান তথা বিশুদ্ধ আকিদার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। আর আকিদা সহিহ ও একনিষ্ঠ হলে সকল ইবাদত কবুলের নিশ্চয়তা রয়েছে। তাছাড়া ইন্তিকালের পর কবরে মুনকার নাকিরের প্রশ্নোত্তর হবে আকিদা সম্পর্কিত। আখিরাতের প্রথম পর্যায়ে (কবরে) আমল সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন করা হবে না।তিনটি প্রশ্নই আকিদা বিষয়ক। যেমন: من ربك (তোমারপ্রভু কে?) ২. وما دينكতোমার ধর্ম কী?), ৩. وما كنت تقول فى حق هذا الرجل الذى بعث فيكم- (এ ব্যক্তি সম্পর্কে (নবীজিকে ইঙ্গিত করে) তোমার অভিমত কি? যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল?) এ ক্ষেত্রে যারা দুনিয়াতে বিশুদ্ধ আকিদার সঙ্গে আমল করেছে তারা তিনটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবে। এবং কিয়ামতে সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত শান্তির স্বর্গীয় পরিবেশে কবর জীবন কাটাতে পারবে। পক্ষান্তরে যারা বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করবে না, তারা কবরে সঠিক জবাব দিতে ব্যর্থ হবে। ফলে কবর জীবন হবে তাদের জন্য এক কষ্টের কারাগার। আকিদা সহীহ না থাকার কারণে তাদের উভয় জগতে রয়েছে লাঞ্ছনা ও শাস্তি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন-

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا اِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا اِلَى هَؤُلَا

“মাঝখানে দোদুল্যমান যাকে, না এদিকের ও দিকের।”][14]
অর্থাৎ দ্বিরকম আকিদা পোষণকরা মানে উভয় জগত বৃথা।

বিশুদ্ধ আকীদা ও ঈমানের গুরুত্ব :

সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতার চাবিকাঠি ও সৌভাগ্যের ভিত্তি।সঠিক বিশ্বাস তথা ঈমান মানুষকে সফলতার শীর্ষে তুলে দেয় এবং তার বিপরীতে অবিশ্বাস শাশ্বত ব্যর্থতার কারণ।আর ঈমান ও কর্মের নাম ইসলাম। বিশুদ্ধ ঈমান ইসলামের মূল ভিত্তি মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার যত ইবাদত ও গুণকীর্তন করে সব কবুল হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো বিশুদ্ধ ঈমান। তাতে কোন প্রকার কুফর ও শিরক থাকতে পারবে না। একথা মহান আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনের বহু স্থানে বলেছেন।

[13] সূরা নাহল: ৯৭

[14] সূরা নিসা: ১৪৩

যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন—

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

"আর পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে ।" [15]

অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-
مَنۡ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا ۖ وَمَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ يُرۡزَقُونَ فِيهَا بِغَيۡرِ حِسَابٖ

"যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে, পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক দেয়া হবে।"[16]

অনুরূপভাবে ইহলৌকিক জীবনে আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ামত, বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্যেও বিশুদ্ধ ঈমান শর্ত।যেমন ইরশাদ হয়েছে—

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত।" [17](সুরা নাহল:৯৭)

দুনিয়াতে সার্বিক বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্য প্রথমত সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী হতে হবে। অতঃপর আল্লাহকে ভয় করে সৎ জীবন যাপন করতে হবে। আর কুফরী বা অবিশ্বাসের শাস্তি হলো ধ্বংস ও ক্ষতি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

[15] সূরা বনি ইসরাইল :১৯

[16] সূরা মুমিন: ৪০

[17] সূরা আরাফ: ৯৬

‘‘যদি জনপদ সমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বরকত-কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা অবিশ্বাস করল, কাজেই আমি তাদের কর্ম অনুযায়ী ফল দান করলাম।’’

আল্লাহর বন্ধুত্ব ও সন্তুষ্টি অর্জনের প্রথম ধাপই বিশুদ্ধ ঈমান।আল্লাহ বলেন :

اَلَاۤ اِنَّ اَوۡلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ۚ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَكَانُوۡا يَتَّقُوۡنَ ؕ

"জেনে রাখ! আল্লাহর ওলিগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্থও হবে না- যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে।" [18]

এখানে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষণীয় :
প্রথমত, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু তাঁর প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ ও বিস্তারিত বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না। এজন্য ওহীর জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়।এজন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ঈমানের স্বরূপ, ভিত্তি, আরকান ইত্যাদি বিস্তারিত অবগত হওয়া ছাড়া বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন করা সম্ভব নয়।
দ্বিতীয়ত, পরবর্তীতে আমরা দেখব, ঈমান অর্জনের ন্যায় সংরক্ষণও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগে যুগে অনেক জাতিই নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আসমানী হিদায়াত ও ঈমান লাভ করেছে। কিন্তু তারা তা সংরক্ষণ করতে পারেনি।বরং বিভিন্ন ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস বা কর্মের মাধ্যমে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলেছে। এজন্য ঈমান বিনষ্টের কারণ ও অবিশ্বাসের স্বরূপ জানা মুমিনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়।

ঈমানের স্বরূপ ও বাস্তবতা

ঈমান হল বিশ্বাস, কথা ও কাজের সমন্বয়। তাই মুমিন হতে হলে অন্তরে বিশ্বাস বা স্বীকৃতি থাকতে হবে যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদত পাওয়ার যোগ্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। সেই সাথে মুখে এই ঘোষণা বা সাক্ষ্য দিতে হবে। এরপর এই সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করতে হবেঃ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে হবে এবং ইবাদতে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। সুতরাং এই তিনটি বিষয় মিলেই ঈমান:

[18] সূরা ইউনুস :৬২,৬৩

১) অন্তরের স্বীকৃতি।

২) মৌখিক ঘোষণা ও

৩) আমল।

মানুষের মুখে প্রচলিত ভাষায় ঈমানকে বিশ্বাস হিসেবে অনুবাদ করা হয়। এজন্য অনেকের ধারণা এই যে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করাই ঈমান। কেউ মনে করেন যে আল্লাহকে এক বলে জানাই ঈমান। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান আরও ব্যাপক, শুধু বিশ্বাস বা জ্ঞানকে ঈমান বলা যায় না। শুধু আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকারকারী আস্তিককে মুমিন বলা যাবে না। তেমনি কেবল ইসলাম ধর্মের সত্যতা কিংবা কুরআন বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্যতা জানাই ঈমান নয়। বরং ঈমান এর চেয়েও বেশি কিছু। ব্যক্তি যখন এই বিশ্বাস বা জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে দুটি সাক্ষ্য দেয় এবং আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে আর তদানুযায়ী আমল করে, তখনই সে মুমিন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যদি শুধু বিশ্বাস ও জ্ঞানই ঈমান হত, তবে স্বয়ং ইবলীসও মুমিন হয়ে যেত! বিতাড়িত ইবলীস ভাল করেই জানে যে আল্লাহ তাআলাই একমাত্র প্রকৃত মাবুদ, সে ভাল করেই জানে যে মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তা সত্ত্বেও সে তার দম্ভ ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে স্থায়ীভাবে বিতাড়িত হয়েছে।আবার অনেকের ধারণা এই যে শুধু মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ - এই ঘোষণা দেয়াই ঈমান। এ ধারণাও সঠিক নয়, কেননা মুনাফিকরাও এই ঘোষণা দিত। শুধু তাই নয়, তারা মুসলিমদের সাথে সালাতও আদায় করত, কিন্তু তাদের অন্তরে তারা লালন করত কুফরী ও ইসলামের প্রতি শত্রুতা। আল-কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই মুনাফিকদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে মুসলিমদেরকে সতর্ক করেছেন এবং জানিয়েছেন যে এরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। তাই শুধু মৌখিক ঘোষণা কাউকে ঈমানদার করে না।ঈমান হল অন্তরের স্বীকৃতি, মৌখিক ঘোষণা এবং আমলের সমষ্টি। এজন্য আল কুরআনে সাফল্য ও জান্নাত লাভের শর্ত হিসেবে বারবার ঈমানের সাথে আমলে সালিহকে জুড়ে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি মোটেই কোন আমল না করে, দ্বীন পালন না করে, তবে তার অন্তরের বিশ্বাস কিংবা মৌখিক ঘোষণা তার কাজে আসবে না।আমল যে ঈমানের অংশ, তার প্রমাণ এই যে কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন আমলকে ঈমান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

»الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ« ِ

“ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে, এর মাঝে সর্বোত্তম হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, আর এর মাঝে সর্বনিম্ন হল পথ থেকে ক্ষতিকর বস্তু সরানো, আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।”[19]

এই হাদীসে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ঘোষণাকে ঈমান বলা হয়েছে। তেমনি পথ থেকে ক্ষতিকর বস্তু সরানো - যা একটি বাহ্যিক আমল, তাকেও ঈমানের অংশ বলা হয়েছে। আবার লজ্জা - যা অন্তরের একটি আমল, তাকেও ঈমান বলা হয়েছে।হাদীসে আরও বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না।”[20]

অর্থাৎ যখন সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে পরিপূর্ণ ঈমানদার থাকে না। তার এই পাপ অনুপাতে তার ঈমান মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।সালাত প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

“আমাদের ও তাদের [অর্থাৎ মুনাফিকদের] মধ্যে চুক্তি [অর্থাৎ এমন বিষয় যার কারণে তাদেরকে মুসলিম গণ্য করা হচ্ছে ও জান-মালের নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে] হল সালাত, যে তা পরিত্যাগ করবে, সে কুফরীতে লিপ্ত হবে”।[21]

অপর হাদীসে এসেছে:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

“নিশ্চয়ই ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মাঝে রয়েছে সালাত ছেড়ে দেয়া।”[22]

এমনিভাবে আরও বহু আমলের সাথে সরাসরি ঈমানের থাকা বা না থাকাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে - যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমল ঈমানেরই একাংশ।ঈমানের বাস্তবতার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক আরও একটি বিষয় হচ্ছে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি। যেমনিভাবে ঈমান অন্তরের স্বীকৃতি, কথা ও কাজের সমষ্টি, তেমনি এই স্বীকৃতি বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা, ঘোষণার সত্যতা ও আমলের পরিমাণ কিংবা মানের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে ঈমানেরও তারতম্য ঘটে। সুতরাং সকলের ঈমান সমপর্যায়ের নয়। আবু বকর, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমুখের

[19] বুখারী, মুসলিম

[20] বুখারী, মুসলিম

[21] আহমদ, তিরমিযী ও অন্যান্য

[22] মুসলিম

ঈমান আর একজন সাধারণ মুসলিমেরঈমানে মধ্যে আছে বিরাট ফারাক। তেমনি একই ব্যক্তির ঈমান ভাল কাজের দ্বারা বৃদ্ধি পায়, মন্দ কাজের দ্বারা হ্রাস পায়। এছাড়া আল্লাহ তাআলার যিকর, তাঁর প্রতি ভালবাসা, ভয়, আশা, ভরসা ও ভক্তির তারতম্যের কারণে ঈমানের তারতম্য হয়। নিয়তের তারতম্যের কারণেও ঈমানের তারতম্য হয়। এই বাস্তবতাকে বোঝানোর জন্যই আলেমগণ বলেন:الإيمان قول وعمل يزيد وينقصঈমান হল কথা ও কাজ, তা বাড়ে ও কমে।ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়টি আল-কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বলেন: إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون প্রকৃত মুমিন তো "তারাই, আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের অন্তর কেঁপে উঠে, আর তাদের কাছে তাঁর আয়াতগুলো পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা একমাত্র তাদের রবের উপরই তাওয়াক্কুল করে।"[23]

এই আয়াতে স্পষ্টত বলা হয়েছে যে কুরআনের আয়াত মুমিনদের ঈমানকে বাড়িয়ে দেয়। إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكمআল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"নিশ্চয়ই তোমাদের কারও অন্তরে ঈমান পোশাক মলিন হয়ে যাওয়ার মত করে পুরোনো হয়ে যায়, সুতরাং আল্লাহর কাছে তোমরা চাও - যেন তিনি তোমাদের ঈমানকে আবার নতুন করে দেন।"[24]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

"যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে, সে ঈমানের মিষ্টি স্বাদ আস্বাদন করবে: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় হবে, এবং সে কোন ব্যক্তিকে ভালবাসলে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে আর সে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে অপছন্দ করবে যেমনিভাবে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।"[25]

«مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ»

"যে আল্লাহর জন্য ভালবাসে, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহর জন্যই দেয় আবার আল্লাহর জন্যই দেয়া থেকে বিরত থাকে, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করেছে।"[26]

---

[23] সূরা আল-আনফাল: ২

[24] আল-হাকিম

[25] বুখারী, মুসলিম

[26] আবু দাউদ

এ হাদীসগুলো থেকেও আমরা ঈমানের তারতম্যের বিষয়টির ইঙ্গিত পাই।সারকথা হল ঈমানের অর্থ অনেক ব্যাপক। অন্তরে বিশ্বাস আছে, কিংবা শাহাদাত পাঠ করে আমরা মুসলিম হয়েছি - এ কথা মনে করে নিশ্চিন্তে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলার কাছে মুমিন হিসেবে গণ্য হতে হলে আমাদেরকে জেনে-বুঝে ঈমানের ঘোষণা দিতে হবে এবং এর দাবী অনুযায়ী আমল করতে হবে: সালাত আদায় করতে হবে, সাওম পালন করতে হবে, যাকাত দিতে হবে, হাজ্জ করতে হবে। তেমনি হত্যা, ব্যভিচার, সুদ, চুরি, মদ্যপান সহ অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজ ছেড়ে দিতে হবে। পর্দা করতে হবে, লজ্জাস্থান, দৃষ্টি, জিহবা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাযত করতে হবে। তেমনি আল্লাহকে ভালবাসা, ভয় করা, তাঁর সওয়াবের আশা রাখা, তাঁর ওপর ভরসা করা সহ অন্তরের অন্যান্য আমলগুলো করতে হবে। এই সবকিছু মিলেই ঈমান।আর এগুলোর তারতম্যের কারণে ঈমানের তারতম্য হয়। এজন্য আল্লাহর রাসূলের যুগে একদল বেদুইন সদ্য ইসলামে প্রবেশ করেই যখন পরিপূর্ণ ঈমানের দাবী করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন:

قَالَتِ ٱلۡأَعۡرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمۡ تُؤۡمِنُواْ وَلَٰكِن قُولُوٓاْ أَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلۡإِيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمۡ ۖ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتۡكُم مِّنۡ أَعۡمَٰلِكُمۡ شَيۡـٔٗا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

“বেদুঈনরা বলল, ‘আমরা ঈমান আনলাম।’ বল, ‘তোমরা ঈমান আননি।’ বরং তোমরা বল, ‘আমরা আত্মসমর্পণ করলাম।’ আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে তিনি তোমাদের আমলসমূহের কোন কিছুই হ্রাস করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [27]

অর্থাৎ তোমাদের ঈমান এখনও পূর্ণতায় পৌঁছেনি, সুতরাং এখনই তোমরা এর দাবী করো না। বরং তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করতে থাক, তবে তোমাদের ঈমান পূর্ণতায় পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়, আর তোমরা যে আমলই কর না কেন - তার পূর্ণ প্রতিদান তোমরা আল্লাহর কাছে পাবে।নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে, ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চিত না থেকে আমাদের কর্তব্য ঈমানকে শেখার, বৃদ্ধি করার ও দৃঢ় করার অবিরাম চেষ্টা করে যাওয়া। নিজেকে পরিপূর্ণ মুমিন দাবী না করে আমাদের উচিৎ ঈমানের দাবী অনুযায়ী সাধ্যমত নেক-আমল করার প্রচেষ্টা চালানো।

[27] সূরা আল-হুজুরাত: ১৪

ঈমানের শর্তাবলী

ইসলামী আকীদার কেন্দ্রবিন্দু হলো "ঈমান"—যা একজন মুসলিমের সমস্ত ধর্মীয় জীবন, নৈতিকতা, সামাজিক আচরণ ও আধ্যাত্মিক অবস্থানের ভিত্তি। ঈমান শুধুমাত্র একটি আধ্যাত্মিক ধারণা নয়; বরং এটি একটি সর্বব্যাপী জীবনদর্শন যা হৃদয়, বুদ্ধি ও কর্ম—এই তিনটি স্তরকে সমানভাবে প্রভাবিত করে। কুরআন ও হাদীসে ঈমানের সম্পূর্ণ কাঠামো এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা বিশ্বাস, চিন্তা, নৈতিকতা এবং আচরণের একটি সমন্বিত রূপ নির্দেশ করে। ঈমানের শর্ত বলতে মূলত সেই সকল ভিত্তিমূলক উপাদানকে বোঝানো হয়, যা পূরণ না হলে ঈমান সম্পূর্ণতা লাভ করে না। এসব শর্ত একটি বিশ্বাসীর আকীদাকে সুসংহত করে এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থার সঠিক রূপ স্থাপন করে।
ঈমানের পূর্ণতা অর্জনের জন্য কয়েকটি মৌলিক শর্ত আছে, যেগুলো হল-

১. জ্ঞান (علم) :
ঈমানের প্রথম শর্ত হলো জ্ঞান। ইসলাম অন্ধ অনুসরণকে সমর্থন করে না। বরং কুরআন বহুস্থানে জ্ঞানহীন বিশ্বাসকে নিন্দা করেছে। জ্ঞান হ'ল ঈমানের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি, যা মানুষকে আল্লাহ, তাঁর গুণাবলী, নবুয়ত, কিয়ামত, তাকদীর এবং অন্যান্য আকীদাগত বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।

২.দৃঢ় বিশ্বাস (يقين) :
জ্ঞান অর্জনের পর হৃদয়ে এমন অটল বিশ্বাস স্থাপন করা, যাতে সন্দেহ বা দ্বিধার কোনো স্থান না থাকে, সেটিই ইয়াকীন।
ইয়াকীনের তিন স্তর আছে:
1. 'ইলমুল ইয়াকীন – যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান
2. 'আইনুল ইয়াকীন – প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মতো নিশ্চিত বিশ্বাস
3. হক্কুল ইয়াকীন – অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব ও অটল বিশ্বাস
ইয়াকীন ঈমানকে শক্তিশালী করে এবং নৈতিক দৃঢ়তা জন্ম দেয়।

৩. অন্তরের স্বীকৃতি (تصديق) :
হৃদয়ের গভীর থেকে ইসলামের প্রতিটি সত্যকে স্বীকার করা।

তাসদীক ছাড়া ঈমান একটি নিষ্প্রাণ ঘোষণা হয়ে যায়।কুরআনে মুনাফিকদের ঈমান নাকচ করা হয়েছে কারণ তাদের অন্তরে সত্যের স্বীকৃতি ছিল না।হৃদয়ের স্বীকৃতি এমন এক অবস্থান যেখানে মানুষ তার বিশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত থাকে।

৪. মৌখিক স্বীকারোক্তি (إقرار باللسان) :
হৃদয়ে যে ঈমান রয়েছে, তা মুখে উচ্চারণ দ্বারা প্রকাশ করা—যেমন শাহাদাত বলা। বহু আলেমের মতে, হৃদয়ে বিশ্বাস থাকলেও মুখে অস্বীকার করা কুফর হিসেবে গণ্য।

৫. আনুগত্য (انقياد) :
আল্লাহ ও রসূল ﷺ-এর আদেশ মেনে চলা, নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং শরীয়তের প্রতি আত্মসমর্পণ করা।কেবল বিশ্বাস নয়; বরং আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা ঈমানের পূর্ণতা নিশ্চিত করে।আনুগত্য ছাড়া ঈমানের সামাজিক ও নৈতিক উপাদান পরিপূর্ণ হয় না।এটি ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি ও আচরণের উৎকর্ষ সাধন করে।

৬. সত্যনিষ্ঠতা (صدق) :
ঈমান গ্রহণে আন্তরিক ও দ্বিমুখিতামুক্ত থাকা।ভণ্ডামি (নিফাক) ঈমানের বিপরীত হিসেবে বিবেচিত।একজন মুমিনের কথা, কাজ ও বিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরি।সত্যনিষ্ঠতা ঈমানকে রক্ষা করে, নৈতিক স্থিরতা প্রদান করে এবং সমাজে মানবিক বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করে।

৭. ভালোবাসা (محبة) :
আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ, কুরআন, ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা থাকা।ভালোবাসা ছাড়া ঈমান শুধু মানসিক স্বীকারোক্তি হয়ে যায়।ভালোবাসাই ঈমানকে প্রাণশক্তি দেয়।একজন মুমিন আল্লাহকে সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসে—এটিই তার ঈমানের পরিপক্কতা।
ভালোবাসা মানুষকে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে।আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ত্যাগ, জিহাদ, ইবাদাত ও আনুগত্যের প্রেরণা তৈরি করে।

৮. কুফর ও শিরকের প্রতি ঘৃণা (بغض) :

ইসলামের বিরোধী বিশ্বাস, আচরণ, মূল্যবোধ ও কুফরের প্রতি অন্তরে বিরোধিতা ও ঘৃণা থাকা।এটি ঈমানের "নেতিবাচক সুরক্ষা"—যা তাকে বিকৃত বিশ্বাস থেকে রক্ষা করে।শিরক বা কুফরকে সমর্থন করা ঈমানের মৌলিক সীমারেখা লঙ্ঘন করে।
কুফরের প্রতি অন্তরের ঘৃণা ঈমানের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে।

ঈমানের শর্তাবলী ইসলামী আকীদার মৌলিক ভিত্তিমূলক দিকসমূহকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে। এগুলো সম্মিলিতভাবে একটি বিশ্বাসীর মানস, হৃদয় ও কর্মকে সুসংহত করে। জ্ঞান ঈমানের বুদ্ধিগত ভিত্তি স্থাপন করে; ইয়াকীন ও তাসদীক হৃদয়ের স্থিরতা তৈরি করে; ইকরার ও আনুগত্য ঈমানকে বাহ্যিক আকার প্রদান করে; সত্যনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা ঈমানকে নৈতিক গভীরতা দেয়; আর কুফরের প্রতি ঘৃণা তা শিরক ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করে।

অতএব, ঈমানের পূর্ণতা কোনো একক উপাদানে নির্ভরশীল নয়; বরং এটি জ্ঞান, বিশ্বাস, অনুভূতি, নৈতিকতা ও আচরণের সমন্বয়—যা একজন মুসলিমের সমগ্র জীবনব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে।

ঈমানের রুকনসমূহ

ঈমানের রুকন ৬টি। সেগুলি হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি ঈমান, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান। কুরআনুল কারীম এবং সহীহ হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী উক্ত রুকনসমূহের প্রত্যেকটির প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত কারো ঈমান পূর্ণ হবে না। যে ব্যক্তি এগুলির কোনো একটিকে অস্বীকার করবে, সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ﴾

"রাসূলের নিকট তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে অহি অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে তিনি এবং মুমিনগণ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছেন। তাঁরা সবাই ঈমান এনেছেন আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। (তাঁরা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তাঁরা বলে, আমরা শুনেছি এবং মেনে

নিয়েছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।”[28]

তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

“ঈমান হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা”[29]

১. আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ঈমান হলো ঈমানের সর্বপ্রথম ও প্রধান ভিত্তি। এর অর্থ হলো— আল্লাহ তা'য়ালা এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের একমাত্র স্রষ্টা, পালনকর্তা, মালিক ও পরিচালক। সকল প্রকার ইবাদত শুধুমাত্র তাঁর জন্যই নির্ধারিত। আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর প্রতি সঠিক বিশ্বাস রাখতে হবে এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলীতে কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা যাবে না।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান

ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্ট নূরানি মাখলুক। তারা আল্লাহর বান্দা, তাঁর নির্দেশের অবাধ্যতা করেন না। তাদের অস্তিত্ব বাস্তব এবং প্রত্যেক ফেরেশতার নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। যেমন— জিবরাইল (আ.) ওহি পৌঁছানোর দায়িত্বে, মিকাইল (আ.) রিযিক ও পরিবেশের দায়িত্বে, ইস্রাফিল (আ.) শিঙ্গা ফুঁকবেন এবং মালাকুল মাউত আত্মা গ্রহণ করেন। ফেরেশতাদের সম্পর্কে কুরআন ও সহিহ হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে তা বিশ্বাস করাই ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান।

৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ মানবজাতিকে হিদায়াত প্রদানের জন্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কিতাব নাজিল করেছেন। এসব কিতাবের মধ্যে তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও কুরআনুল কারিম প্রসিদ্ধ। বিশ্বাস করতে হবে যে এসব কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রেরিত। কুরআনুল কারিম সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ

[28] সূরা বাকারা: ২৮৫

[29] মুসলিম

কিতাব, এবং এটি কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য হিদায়াতের চূড়ান্ত উৎস। পূর্বের কিতাবসমূহ পরিবর্তিত হলেও কুরআন আল্লাহর হেফাজতে সংরক্ষিত।

৪. নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা— সত্যবাদী, আমানতদার এবং আল্লাহর বার্তা পৌঁছানোর জন্য প্রেরিত। প্রত্যেক নবীর প্রতি সম্মান ও বিশ্বাস রাখা ঈমানের অংশ। বিশ্বাস রাখতে হবে যে শেষ নবী ও রাসূল হলেন মুহাম্মদ (সা.) ; তাঁর পরে আর কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না। সমস্ত রাসূলই মানবজাতিকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের দিকে আহ্বান করেছেন।

৫. আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান

আখেরাতের প্রতি ঈমান ইসলামী আকীদাহর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর অন্তর্ভুক্ত— মৃত্যুর পরের জীবন, কবরের আজাব ও নেয়ামত, কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান, হাশর-নসর, হিসাব-নিকাশ, আমলের পাল্লা (মিজান), সিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের বাস্তবতা। প্রত্যেক মানুষকে তার দুনিয়ার আমলের পূর্ণ প্রতিফল ভোগ করতে হবে— এ বিশ্বাস আখেরাতের ঈমানের অংশ।

৬. তাকদিরের প্রতি ঈমান— এর ভাল-মন্দ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে

তাকদিরে ঈমানের অর্থ হলো— আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছু পূর্ব থেকেই জানেন, সব ঘটনা লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না এবং সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালা। দুনিয়ায় যা ভালো-মন্দ ঘটে— সবই আল্লাহর জ্ঞাত ও নির্ধারণসাপেক্ষ। তবে মানুষ তার কর্মের জন্য জবাবদিহি করবে। তাকদিরের এই চারটি স্তর মেনে নেওয়া ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য অপরিহার্য।

ঈমান কম-বেশি হয় নাকি একই অবস্থায় থাকে?

বিশুদ্ধ আক্বীদা হল, সৎকর্মে ঈমান বৃদ্ধি পায় ও পাপ কর্মে তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ বলেন, "মুমিন কেবল তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।"[30]

একই মর্মে বর্ণিত হয়েছে, সূরা আলে ইমরান ১৭৩, সূরা তওবা ১২৪ প্রভৃতি আয়াতে।

[30] সূরা আনফাল : ২

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এই আয়াত ও তার সমার্থক অন্যান্য আয়াত দ্বারা ইমাম বুখারী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির দলীল নিয়েছেন। এটি হ'ল জমহূর উম্মাহর মাযহাব। শাফেঈ, আহমাদ ও আবু উবায়েদ প্রমুখ বিদ্বানগণ এ বিষয়ে ইজমার দাবী করেছেন।[31]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঈমানের সত্তর-এর অধিক শাখা রয়েছে। যার মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। আর সর্বনিম্ন হ'ল রাস্তা থেকে কষ্ট দূর করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা'।[32]
তিনি বলেন, ...যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজের হাত দ্বারা জিহাদ করবে, সে মুমিন। যে ব্যক্তি যবান দ্বারা জিহাদ করবে, সেও মুমিন এবং যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা (ঘৃণার মাধ্যমে) জিহাদ করবে, সেও মুমিন। এরপর এক সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান নেই'।[33]
উপরোক্ত হাদীস সমূহ প্রমাণ করে যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি রয়েছে।

তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। অবশ্য ইবনু আব্দিল বার্র মালেকী ও ইবনু আবিল 'ইয হানাফীর মতে, তিনি পরবর্তীতে এ সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসেছিলেন। [34]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে সৎকাজের মাধ্যমে বান্দার ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপ কাজের মাধ্যমে ঈমান কমে যায়। এব্যাপারে কুরআন ও সহীহ হাদীছে অসংখ্য দলীল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ

{ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

''যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি পায়''।[35]

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

''যারা সঠিক পথপ্রাপ্ত আল্লাহ তাদের হেদায়াতকে (ঈমানকে) আরও বাড়িয়ে দেন''।[36]

---

[31] ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আনফাল:২

[32] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫

[33] মুসলিম হা/৫০, মিশকাত হা/১৫৭

[34] আত-তামহীদ ৯/২৪৭; শরহ আক্বীদা তাহাবিইয়াহ ৩৯৫ পৃঃ

[35] সূরা ফাতহ : ৪

[36] সূরা মারইয়াম: ৭৬

আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى

“যারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের ঈমান আরও বেড়ে যায়”।[37]

আল্লাহ্ তা’আলার বাণীঃ

وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا

“এবং ঈমানদারদের ঈমান যাতে আরও বৃদ্ধি পায়”। [38]

ঈমান কীভাবে বাড়ে ও কমে

ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস উভয়ই একটি চলমান প্রক্রিয়া। আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বাড়ে, আর পাপের মাধ্যমে কমে। ঈমান বাড়ানোর জন্য কোরআন তেলাওয়াত, আল্লাহর জিকির, সাহাবীদের জীবনী চর্চা, এবং আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা সহ বিভিন্ন আমল করা যেতে পারে। অন্যদিকে, পাপ, সন্দেহ, এবং খারাপ সঙ্গের কারণে ঈমান কমে যেতে পারে।

ঈমান যেভাবে বৃদ্ধি পায়-

কোরআন তেলাওয়াত: নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়।
আল্লাহর জিকির: আল্লাহকে স্মরণ করা (যিকির) ঈমানকে শক্তিশালী করে।
সৎকাজ: ভালো কাজ করলে ঈমান বাড়ে, যেমন- কাউকে সাহায্য করা, দান করা।
ইসলামি জ্ঞান অর্জন: ইসলামি জ্ঞান বৃদ্ধি করলে ঈমানও বাড়ে।
আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা: আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা এবং তাঁর মহিমা উপলব্ধি করা ঈমানকে বৃদ্ধি করে।
সৎসঙ্গ: ভালো মানুষের সাথে মিশলে ঈমান বৃদ্ধি পায়।

ঈমান যেভাবে হ্রাস পায়-

পাপ: পাপ করলে ঈমান কমে।
সন্দেহ: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সন্দেহ করলে ঈমান কমে যায়।
খারাপ সঙ্গ: খারাপ মানুষের সাথে মিশলে ঈমান দুর্বল হতে পারে।

---

[37] সূরা মুহাম্মাদ: ১৭

[38] সূরা মুদ্দাছ্ছির: ৩১

গাফলতি: ধর্মীয় কাজ থেকে দূরে থাকলে বা গাফলতি করলে ঈমান কমে যেতে পারে।
ইসলামি জ্ঞানহীনতা: ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান কম থাকলে বা না থাকলে ঈমান দুর্বল হতে পারে।

ঈমান একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, তাই এর বৃদ্ধি ও হ্রাসের জন্য নিয়মিত আমল করা ও খারাপ কাজ পরিহার করা জরুরি।

ঈমান ও কুফর

কুফর কী?

আরবী "কুফর" (نقر) শব্দটি অবিশ্বাস, অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটির মূল অর্থ 'আবৃত করা'। ৪র্থ হিজরি শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস [৩৯৫ হি.] বলেন: ("কাফ, ফা ও রা) তিন অক্ষরের ক্রিয়ামূলটি একটি বিশুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে, তা হল : 'আবৃত করা বা গোপন করা'।কোন ব্যক্তি যদি তার পরিহিত বর্মকে তার কাপড় দিয়ে আবৃত করেন তবে বলা হয় তিনি তার বর্ম কুফর করেছেন। চাষীকে 'কাফির' (আবৃতকারী) বলা হয়, কারণ তিনি শস্যদানাকে মাটি দ্বারা আবৃত করেন।ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত অবিশ্বাসকে কুফর বলা হয়, কারণ অবিশ্বাস অর্থ সত্যকে আবৃত করা।অকৃতজ্ঞতা বা নিয়ামত অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়; কারণ এতে নিয়ামত লুকানো হয় এবং আবৃত করা হয়।
ইসলামী পরিভাষায় বিশ্বাসের অবিদ্যমানতাই কুফর বা অবিশ্বাস। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর এবং ঈমানের রুকনগুলিতে বিশ্বাস না থাকাকেই ইসলামের পরিভাষায় 'কুফর' বলে গণ্য। অস্বীকার, সন্দেহ, বিদ্বেষ, হিংসা, অহংকার, ইত্যাদি যে কোনো কারণে যদি কারো মধ্যে 'ঈমান' বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বিশ্বাস অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'কুফর' বলে গণ্য করা হয়।অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোনো বিষয়ে তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ বা তাঁর সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব ও অতুলনীয়ত্ব অস্বীকার করাও কুফর। তবে এ পর্যায়ের কুফরকে ইসলামী পরিভাষায় শিরক বলা হয়।

কুফরের প্রকারভেদ :

কুরআন ও হাদিসের আলোকে কুফরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

(১)কুফর আকবার বা বৃহত্তর কুফর এবং

(২)কুফর আসগর বা ক্ষুদ্রতর কুফর।

কুফর আকবার বলতে প্রকৃত অবিশ্বাস বোঝানো হয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং প্রকৃত অবিশ্বাসী বা কাফিরে পরিণত করে। এর পরিণতি চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তিভোগ। আর কুফর আসগার বলতে বোঝানো হয় কঠিন পাপসমূহকে যা অবিশ্বাসেরই নামান্তর,তবে এরূপ পাপে লিপ্ত মানুষদেরকে ইসলাম ত্যাগকারী বা প্রকৃত কাফির বলে গণ্য করা হয় না। তাদেরকে অনন্ত জাহান্নামবাসী বলেও বিশ্বাস করা হয় না।বরং তাদেরকে পাপী ও শাস্তিযোগ্য মুসলিম বলে গণ্য করা হয়। কুফর আসগারকে কুফর মাজাযী বা রূপক কুফরও বলা হয়।

কুফরের পরিণতি :

যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে না আল্লাহর দীনকে স্বীকার করে না, তারাই কাফির মুশরিক। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের দুর্ভোগ এবং অনন্ত অসীম শাস্তি। এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ইসলামই হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন বা সার্বজনীন ধর্ম। আর তা সত্য দ্বীন এবং এমন দ্বীন যা নিয়ে সমস্ত নবী ও রাসূলগণ আগমন করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তিনি তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে মহান প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং যে তাঁর কুফরি করে, তাকে কঠিন শাস্তি দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ لَا تَبۡدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ٦٤﴾ [يونس[٦٣، ٦٤ :

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবি এবং আখিরাতে। আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই মহা সফলতা।"[39]

আর যেহেতু আল্লাহ বিশ্বজগতের স্রষ্টা, অধিপতি ও কর্তৃত্বকারী, আর আপনি মানুষ হলেন তাঁর একটি সৃষ্ট জীব। তাই তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বজগতের অনেক কিছুকে আপনার অনুগত করেন, আপনার জন্য তাঁর বিধান রচনা করেন ও আপনাকে তাঁর আনুগত্য করার আদেশ দেন। সুতরাং আপনি যদি তাঁর উপর বিশ্বাস আনেন এবং তিনি আপনাকে যা আদেশ করেছেন তা পালন করেন, আর তিনি আপনাকে যা হতে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করেন, তাহলে আল্লাহ আপনার সাথে আখিরাত দিবসে যে স্থায়ী নিয়ামতের ওয়াদা করেছেন তা লাভ করবেন। দুনিয়াতে যে সব বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত আপনাকে দান করেছেন তা অর্জন করবেন। আর জ্ঞানের দিক দিয়ে যার সৃষ্টি পরিপূর্ণ এবং যাদের অন্তর অধিক পবিত্র

39

যেমন; নবী, রাসূল, নেককার, ও সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতামণ্ডলী, আপনি তাদের মত হলেন। আর যদি আপনার প্রভুর কুফরি করেন ও অবাধ্য হন, তাহলে তো আপনি আপনার দুনিয়া ও আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করলেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আপনি তাঁর ঘৃণা ও আযাবকে গ্রহণ করলেন। আল্লাহ বলেন,

﴿قَدۡ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ ٤٥﴾ [يونس[٤٥ :

"তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকার করেছে, আর তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না।"[40]

নিম্নে বিস্তৃতভাবে কুফুরীর কিছু পরিণাম উপস্থাপন করা হলো :

১. আত্মিক অশান্তি ও হৃদয়ের অন্ধকার :
কুফর হৃদয়কে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে মানুষের অন্তরে স্থায়ী অশান্তি, ভয়, অস্থিরতা ও নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। কুফরের কারণে হৃদয় পাথরের মতো কঠিন হয়ে যায়, ফলে সৎ পথ গ্রহণ করার ক্ষমতা কমে যায়।

২. নৈতিক অধঃপতন ও চরিত্রের বিপর্যয় :
ঈমান মানুষকে নৈতিকতা দেয়, আর কুফর সেই নৈতিক ভিত্তিকে ভেঙে দেয়। কুফরী মনোভাবে মানুষের ভেতর থেকে সত্য-অসত্যের পার্থক্য ক্ষীণ হয়, ফলে মিথ্যা, অন্যায়, অহংকার, স্বেচ্ছাচারিতা এবং মানবিকতার পতন দেখা দেয়। সমাজে অন্যায়-অত্যাচার বৃদ্ধি পায় এবং ন্যায়বিচার দুর্বল হয়ে পড়ে।

৩. দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া :
কুফর মানুষের জীবনে দুনিয়ার পরীক্ষা ও বিপদকে বাড়িয়ে দেয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, যে জাতি কুফরে লিপ্ত হয়, তাদের থেকে আল্লাহ বরকত উঠিয়ে নেন—ফলে শান্তি, ঐক্য,

40

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক শৃঙ্খলা সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কুফর সমাজে অশান্তি, বিভেদ, যুদ্ধ ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।

৪. কবরের শাস্তি :

হাদিসে এসেছে, কুফরী ব্যক্তি মৃত্যুর পর কবরের ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হয়। কবর তার জন্য জান্নাতের বাগানের বদলে জাহান্নামের গর্ত হয়ে দাঁড়ায়। ফেরেশতারা কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করে, এবং সে ইসলামের মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারে না। কবরের সংকোচন, অন্ধকার ও শাস্তি তার জন্য অব্যাহত থাকে।

৫. আল্লাহর কাছে কোনো আমল গ্রহণ না হওয়া :

কুফরের সবচেয়ে বড় পরিণতি হলো—কুফরীর অবস্থায় কেউ যত ভালো কাজই করুক, আল্লাহ তার কোনো আমল গ্রহণ করেন না। কারণ ঈমান ছাড়া আমল আল্লাহর কাছে মূল্যহীন। কুরআনে বলা হয়েছে, কুফরের কারণে মানুষের সৎকর্ম বাতাসে উড়ে যাওয়া ধূলার মতো—যার কোনো মূল্য বা স্থায়িত্ব নেই।

৬. আখিরাতে চিরস্থায়ী শাস্তি :

কুফরের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি হলো জাহান্নামের অনন্ত শাস্তি। কুরআন ও হাদিসে বলা হয়েছে, কুফরী ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তার জন্য নেই বিশ্রাম, নেই মুক্তি। আগুন, তপ্ত জল, শিকল, অন্ধকার—এসব কঠিন শাস্তি তার সঙ্গী হবে। জাহান্নামের শাস্তি অস্থায়ী নয়; কুফরী ব্যক্তি সেখানে চিরদিন থাকবে।

৭. আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা :

কুফর মানুষকে আল্লাহর দয়া, ভালোবাসা ও রহমত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র পথ হলো ঈমান, আর কুফর সেই দরজা বন্ধ করে দেয়। ফলে কুফরীর উপর আল্লাহর ক্রোধ অবতীর্ণ হয়।

৮. আশা ও মুক্তিহীন ভবিষ্যৎ :

কুফর মানুষকে আখিরাতের অনন্ত সুখ থেকে বঞ্চিত করে। ঈমানদারের জন্য জান্নাত সৌন্দর্য, শান্তি, আরাম আর আল্লাহর সাক্ষাতের সুখ; আর কুফরীর জন্য চিরতরে সেই সুযোগ হারানো। কুফর মানুষকে এমন এক শেষ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, যেখানে নেই আনন্দ, নেই ক্ষমা, নেই মুক্তির কোনো পথ।

সুতরাং, কুফরের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ—যা দুনিয়া, কবর ও আখিরাত সব জাগায় মানুষকে গভীর ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়। ঈমান মানুষকে যেমন আলোকিত করে, তেমনি কুফর তাকে অন্ধকার ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তাই কুফর থেকে বাঁচা এবং বিশুদ্ধ ঈমানের উপর অটল থাকা প্রতিটি মানুষের সর্বোচ্চ দায়িত্ব।

ঈমান ও শিরক

শিরক কী?

আরবীতে শিরক অর্থ অংশীদার হওয়া (To share, participate, be partner, associate)। ইশরাক ও তাশরীক অর্থ অংশীদার করা বা বানানো। সাধারণভাবে শিরক শব্দটিকেও আরবীতে অংশীদার করা বা সহযোগী বানানো অর্থে ব্যবহার করা হয়।ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর কোনো বিষয়ে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা বা আল্লাহর প্রাপ্য কোনো ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য পালন করা বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকাকে শিরক বলা হয়। এক কথায় 'আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয় অন্য কাউকে অংশী বানানোই শিরক।

কুরআনের ভাষায় শিরক হলো কাউকে 'আল্লাহর সমতুল্য' করা।আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"অতএব তোমরা জেনে-শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।" [41]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾

"এবং তারা আল্লাহর সমতুল্য উদ্ভাবন করে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য।"[42]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কঠিন পাপ কী? তিনি বলেন: সবচেয়ে কঠিন পাপ এই যে, তুমি আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।” [43]

---

[41] সূরা বাকারা : ২২

[42] সূরা ইবরাহীম : ৩০

[43] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯০-৯১

এভাবে আমরা দেখছি যে, কাউকে মহান আল্লাহর 'নিদ্দ' মনে করাই শিরক। আরবীতে 'নিদ্দ' (النِّدّ) অর্থ সমতুল্য,মত, সমকক্ষ, তুলনীয় ইত্যাদি। কাউকে মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাত,আসমা, সিফাত বা ইলাহিয়্যাত-এর ক্ষেত্রে তাঁর সমতুল্য মনে করা,অথবা আল্লাহকে ভক্তি প্রদর্শন করা হয় বা আল্লাহর জন্য যে ইবাদত করা হয় তা অন্য কাউকে প্রদান করাই শিরক।[44]

শিরকের প্রকারভেদ :

কুরআন কারীমের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তাওহীদ ও শিরক বিষয়ক আলোচনা। হাদীস শরীফেও শিরকের আলোচনা ব্যাপক । স্বভাবতই মুসলিম উম্মাহর আলিমগণও শিরক-কুফর নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। শিরকের প্রকৃতি অনুঢাবন করার জন্য তারা শিরককে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন।শিরকের ভয়াবহতা অনুসারে শিরক কে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে : (১) শিরক আকবার অর্থাৎ বৃহত্তর শিরক বা প্রকৃত শিরক এবং (২) শিরক আসগার অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর শিওরক। তাওহীদের বৈপরীত্যের ভিত্তিতে শিরককে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। আবার কুরআন ও হাদিসে উল্লেখিত শিরকী কর্মসমূহের ভিত্তিতে শিরককে অনেক ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

শিরক আকবার ও শিরক আসগার সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. শিরকে আকবার(বড় শিরক) যা বান্দাকে মিল্লাতের গন্ডী থেকে বের করে দেয়। এ ধরণের শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি যদি শিরকের উপরই মৃত্যুবরণ করে, এবং তা থেকে তওবা না করে থাকে, তাহলে সে চিরস্থায়ী ভাবে দোজখে অবস্থান করবে। শিরকে আকবর হলো গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া যে কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর উদ্দেশ্যে কোন ইবাদত আদায় করা, গাইরুল্লাহর উদ্দেশে কুরবানী করা, মান্নাত করা, কোন মৃত ব্যক্তি কিংবা জ্বিন অথবা শয়তান কারো ক্ষতি করতে পারে কিংবা কাউকে অসুস্থ করতে পারে, এ ধরনের ভয় পাওয়া, প্রয়োজন ও চাহিদা পূর্ণ করা এবং বিপদ দূর করার ন্যায় যে সব ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ক্ষমতা রাখেনা সে সব ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আশা করা।
আজকাল আওলিয়া ও বুযুর্গানে দ্বীনের কবরসমূহকে কেন্দ্র করে এ ধরনের শিরকের প্রচুর চর্চা হচ্ছে। এদিকে ইশারা করে আল্লাহ বলেন:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

[44] তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান) ১/১৬৩-১৬৪

“তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর ইবাদত করে, যা না তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে, না করতে পারে, কোন উপকার। আর তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।” [45]

২.শিরকে আসগার (ছোট শিরক) শিরক আসগার বান্দাকে মুসলিম মিল্লাতের গন্ডী থেকে বের করে দেয়না, তবে তার একত্ববাদের আক্বীদায় ত্রুটি ও কমতির সৃষ্টি করে। এটি শিরকে আকবারে লিপ্ত হওয়ার অসীলা ও কারণ।

এ ধরনের শিরক দু’প্রকার:

প্রথম প্রকার: স্পষ্ট শিরক এ প্রকারের শিরক কথা ও কাজের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

কথার ক্ষেত্রে শিরকের উদাহরণ:

আল্লাহর ব্যতীত অন্য কিছুর কসম ও শপথ করা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:“যে ব্যক্তি গাইরুল্লার কসম করল, সে কুফুরী কিংবা শিরক করল’।[46]

অনুরূপভাবে এমন কথা বলা যে, ”আল্লাহ এবং তুমি যেমন চেয়েছ” ماشاء الله وشئت কোন এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে “আল্লাহ এবং আপনি যেমন চেয়েছেন” কথাটি বললে তিনি বললেন, ”তুমি কি আমাকে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থির করলে? বরং বল, আল্লাহ এককভাবে যা চেয়েছেন।”[47]

আর কাজের ক্ষেত্রে শিরকের উদাহরণ:

যেমন বিপদাপদ দূর করার জন্য কড়ি কিংবা দাগা বাঁধা, বদনজর থেকে বাঁচার জন্য তাবীজ ইত্যাদি লটকানো। এসব ব্যাপারে যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, এগুলো বলা-মসীবত দূর করার মাধ্যম ও উপকরণ, তাহলে তা হবে শিরকে আসগার। কেননা আল্লাহ এগুলোকে সে উপকরণ হিসাবে সৃষ্টি করেননি। পক্ষান্তরে কারো যদি এ বিশ্বাস হয় যে, এসব বস্তু স্বয়ং বালা- মুসীবত

---

[45] সূরা ইউনুস : ১৮

[46] তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাসান বলেছেন। আর হাকেম একে সহীহ বলে অবহিত করেছেন। হাদিস নং ১৫৩৫,মুসতাদরাক হাকিম,১/১৭]

[47] ইবনে আবি হাতিম, নাসায়ী-,৯৭৭,৩৭০৪]

দূর করে, তবে তা হবে শিরক আকবর। কেননা এতে গাইরুল্লাহর প্রতি সেই ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।

দ্বিতীয় প্রকার: গোপন শিরক

এ প্রকার শিরকের স্থান হলো ইচ্ছা, সংকল্প ও নিয়তের মধ্যে। যেমন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ও প্রসিদ্ধি অর্জনের জন্য কোন আমল করা। অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায় এমন কোন কাজ করে তা দ্বারা মানুষের প্রশংসা লাভের ইচ্ছা করা। যেমন সুন্দর ভাবে নামায আদায় করা, কিংবা সদকা করা এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষ তার প্রশংসা করবে, অথবা সশব্দে যিকির- আযকার পড়া ও সুকণ্ঠে তেলাওয়াত করা যাতে তা শুনে লোকজন তার গুণগান করে। যদি কোন আমলে রিয়া তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য সংমিশ্রিত থাকে, তাহলে আল্লাহ তা বাতিল করে দেন।

আল্লাহ বলেন:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। ” [48]

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমাদের উপর আমি যে জিনিসের ভয় সবচেয়ে বেশী করছি তা হল শিরকে আসগর। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রসূলাল্লাহ! শিরকে আসগর কি? তিনি বললেন: রিয়া (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করা)।” [49]

পার্থিব লোভে পড়ে কোন আমল করাও এ প্রকার শিরকের অন্তর্গত। যেমন কোন ব্যক্তি শুধু মাল- সম্পদ অর্জনের জন্যেই হজ্জ করে, আযান দেয় অথবা লোকদের ইমামতি করে, কিংবা শরয়ী জ্ঞান অর্জন করে বা জিহাদ করে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“দীনার, দিরহাম এবং খামিসা- খামিলা (তথা উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ) এর যারা দাস, তাদের ধ্বংস। তাকে দেয়া হলে সে সন্তুষ্ট হয়, আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।” [50]

---

[48] সূরা কাহাফ: ১১০

[49] আহমদ ৩/৩০,ইবনে মাজাহ হা নং৫২০৪, তাবারানী, বাগাভী

[50] সহিহ বুখারী, খন্ড ৮ অধ্যায় ৭৬ হাদিস ৪৪৩)

ইমাম ইবনুল কাইয়েম (রহ) বলেন সংকল্প ও নিয়্যাতের শিরক হলো এমন এক সাগর সদৃশ যার কোন কূল- কিনারা নেই। খুব কম লোকই তা থেকে বাঁচতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি তার আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু ও গাইরুল্লাহর কাছে ঐ আমলের প্রতিদান প্রত্যাশা করে, সে মূলতঃ উক্ত আমল দ্বারা তার নিয়ত ও সংকল্প নিয়্যত খালিছ ভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে করা। এটাই হলো সত্যপন্থা তথা ইব্রাহীমের মিল্লাত, যা অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এতদ্ব্যতীত তিনি কারো কাছ থেকে অন্য কিছু কবুল করবেন না। আর এ সত্য পন্থাই হলো ইসলামের হাকীকত।

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۝
"কেহ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবেনা এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত।"[51]

শিরকে আকবার ও শিরকে আসগারের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সেগুলো হল:
১. কোন ব্যক্তি শিরকে আকবারে লিপ্ত হলে সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যায়। পক্ষান্তরে শিরকে আসগারের ফলে সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয় না।
২. শিরকে আকবরে লিপ্ত ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে শিরকে আসগারে লিপ্ত ব্যক্তি জাহান্নামে গেলে চিরকাল সেখানে অবস্থান করবেনা।
৩. শিরকে আকবার বান্দার সমস্ত আমল নষ্ট করে দেয়, কিন্তু শিরকে আসগার সব আমল নষ্ট করেনা। বরং রিয়া ও দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে কৃত আমল শুধু তৎসংশ্লিষ্ট আমলকেই নষ্ট করে।
৪. শিরকে আকবারে লিপ্ত ব্যক্তির জান-মাল মুসলমানদের জন্য হালাল। পক্ষান্তরে শিরকে আসগারে লিপ্ত ব্যক্তির জান-মাল কারো জন্য হালাল নয়।]

শিরকের ভয়াবহতা :

শিরক-কুফরের মূলোৎপাটনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহে বিশেষভাবে বারংবার এর ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা এ বিষয়ে যা জানতে পারি তার অন্যতম:

---

[51] আলে ইমরান:৮৫

ভয়ঙ্করতম পাপ

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিরক-কুফর মানব জীবনের ভয়ঙ্করতম পাপ। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

"বল, 'এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শুনাই: তা এই যে, তোমরা তাঁর কোনো শরীক করবে না .....।"[52]

ইতোপূর্বে আমরা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "জঘণ্যতম পাপ এই যে, তুমি কাউকে আল্লাহর সমতূল্য বানাবে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ

"সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা, মানুষ হত্যা করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা এবং মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।"[53]

কুফর-শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না

তাওবা বা অনুতপ্ত হয়ে পাপ বর্জন করা সকল পাপের ক্ষমার পথ। তবে মহান আল্লাহ তাওবা ছাড়াও নেক কর্মের কারণে, শাস্তির মাধ্যমে বা তাঁর অপার করুণায় অন্য সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন। তবে শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।"[54]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا

"আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।"[55]

---

[52] সূরা আন'আম: ১৫১

[53] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৫১৯,২৫৩৫

[54] সূরা নিসা: ৪৮

[55] সূরা নিসা: ১১৬

শিরক-কুফর সকল নেক কর্ম ধ্বংস করে

অন্য সকল পাপের সাথে শিরক-কুফরের মৌলিক পার্থক্য এই যে, সাধরণভাবে পাপের কারণে পুন্য বিনষ্ট হয় না। কিন্তু শিরকের কারণে মানুষের সকল নেক কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, 'তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত'।"[56]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين

"কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[57]

মহান আল্লাহ ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, নূহ, দাঊদ, সুলাইমান, আইঊব, ইউসূফ, মূসা, হারূন, যাকারিয়্যা, ইয়াহইয়া, ঈসা, ইলইয়াস, ইসমাঈল, ইলইয়াসা, ইউনুস, লূত (আলাইহিমুস সালাম) ও তাঁদের বংশের নেককার মানুষদের কথা উল্লেখ করে বলেন:

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"এ হলো আল্লাহর হেদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এদ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। তারা যদি শির্ক করত তবে তারা যা কর্ম করত সবই বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যেত।"[58]

শিরক-কুফর জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ

শিরক মুক্ত সকল পাপে লিপ্ত মানুষ আখিরাতে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করে, অথবা আল্লাহর অনুগ্রহে কারো শাফা'আতের কারণে বা শাস্তিভোগের পরে জান্নাত লাভ করবেন। সকল পাপীই মহান আল্লাহর বিশেষ ক্ষমার আশা করতে পারেন। তবে শিরকে লিপ্ত মানুষের জন্য কোনোই আশা নেই। জান্নাত একমাত্র তাওহীদ-পন্থীদের আবাসস্থল। এজন্য মহান আল্লাহ শিরকে লিপ্তদের জন্য তা হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

---

[56] সূরা যুমার: ৬৫

[57] সুরা মায়িদা: ৫

[58] সূরা আন'আম: ৮৮

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস জাহান্নাম; জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।"[59]

আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন:

مَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً

"যে ব্যক্তি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে পৃথিবী পরিমাণ পাপ-সহ আমার সাথে সাক্ষাত করবে আমি সমপরিমাণ ক্ষমা-সহ তার সাথে সাক্ষাত করব।"[60]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلا الشِّرْكَ

"জাহান্নামে সবচেয়ে কম শাস্তি ভোগ করবে যে ব্যক্তি তাকে মহান আল্লাহ বলবেন, পৃথিবীর সবকিছুর মালিকানা তুমি যদি পেতে তবে কি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সবকিছু ফিদইয়া হিসেবে দান করে দিতে? লোকটি বলবে: হ্যাঁ। মহান আল্লাহ বলবেন, আমি তো তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক সহজ একটি বিষয় চেয়েছিলাম; তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করছিলে তখন আমি তোমার কাছে চেয়েছিলাম যে তুমি আমার সাথে শিরক করবে না। কিন্তু তুমি শিরক পরিত্যাগ করলে না।"[61]

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

ওযু যেমন ছুটে যায়, সালাত যেমন নষ্ট হয়, রোজা ও যেমন ভঙ্গ হয়ে যায় তেমনি ইসলামও ছুটে যায়,ঈমানও ভঙ্গ হয় গুরুতর কিছু পাপের কারণে।ফলে ওই পাপী ব্যক্তি মুসলমানের মিল্লাত থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং সেটা কী কারনে হয় তা আমরা অনেকেই জানি না। আর এটাই সবচেয়ে বড় বিপজ্জনক বিষয়। যেসব পাপের কারণে ইসলাম থেকে মানুষ নিষ্কৃত হয়ে যায়, পরিণতিতে তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং তাওবাহ না করলে কাফিরদের মতোই চিরস্থায়ী জাহান্নামী হতে হবে সে বিষয়গুলোর সার সংক্ষেপ মক্কা শরীফের দারুল হাদীসের শিক্ষক ও বহু গ্রন্থ প্রনেতা আল্লামা মুহাম্মদ বিন জামিল যাইনুর রচনাবলি থেকে নিচে এ জাতীয় পাপ কাজের কিয়দাংস তুলে ধরা হল:

---

[59] সূরা মায়িদা: ৭২

[60] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৬৮

[61] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২১৩

১. শিরক করা:

যেমন, নবী বা মৃত আউলিয়াদের নিকট কিছু চাওয়া অথবা কোন ওলী আউলিয়ার অনুপস্থিতিতে দূর থেকে তার কাছে সাহায্য চাওয়া অথবা ঐ পীর বুযুর্গের উপস্থিতিতে তার কাছে এমন কিছু চাওয়া যা দেয়ার ক্ষমতা তার নেই। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ

"আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডেকো না, যা না করতে পারে তোমার কোন উপকার, আর না করতে পারে তোমার ক্ষতি। আর যদি তা করেই ফেল, তবে অবশ্যই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (অর্থাৎ তুমি মুশরিক হয়ে যাবে)"।

(সুরা ইউনুস: ১০৬)

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাদীস শরীফে এসেছে।

عن جابرٍ قال أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل يريدُ الإسلامَ فقال ما المُوجبتانِ ؟ قال : " مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ دَخَلَ النَّار"

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! অবধাররিতকারী দুটি বিষয় কি? তিনি বললেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে যাবে।

২. বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসে তুষ্ট না থাকা:

তাওহীদের কথা শুনলে যাদের মনে বিতৃষ্ণা আসে এবং বিপদে-আপদে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া থেকে দূরে থাকে। আর অন্তরে মুহাব্বতের সাথে ডাকে রাসূলুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বা মৃত ওলি আউলিয়া ও জীবিত (অনুপস্থিত) পীর মাশায়েখদেরকে এবং সাহায্য চায় তাদেরই কাছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ

"আখিরাতের প্রতি প্রকৃত ঈমান যারা আনেনি তাদের কাছে যখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরে বিতৃষ্ণা লাগে। আর যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য নাম উচ্চারণ করা হয় ,তখন তাদের মনে আনন্দ লাগে।"

(সুরা যুমার :৪৫)

৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবাই করা :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা কোন ওলীর নাম নিয়ে পশু জবাই করা। এটা নিষেধ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"সুতরাং, তুমি শুধু তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং তাঁর জন্য (তাঁরই নামে) যবেহ করো।"

(সূরা কাউসার: ২)

উল্লেখ্য যে, যবাইয়ের সময় কেউ যদি বলে, 'খাজা বাবা-জিন্দাবাদ' তাহলে এটা তার ঈমান ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৪. কোন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মান্নত করা:

যেমন, কবরে মাজারে মান্নত করা (শিরনী দেয়া) অত্যন্ত গর্হিত কাজ, ঈমান বিনষ্টকারী পাপ, শিরক ও কবীরাহ গুনাহ। কারণ, মান্নত একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে।

৫. আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপর ভরসা করা :

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ

"একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করো যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো।" (সুরা ইউনুস: ৮৪)

৬. গায়রুল্লাহকে সিজদা করা :

জেনে-বুঝে কোন রাজা, বাদশা, পীর, বুজুর্গ, জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে ইবাদতের নিয়তে রুকু বা সিজদা করা। রুকু বা সিজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত ইবাদত। এ ধরনের কোন কাজ বান্দার জন্য করলে ঈমানদার ব্যক্তি বেঈমান হয়ে যাবে।

৭.ইসলামের কোন একটি রুকন অস্বীকার করা :

যেমন- ঈমান, সালাত, সওম, যাকাত ও হজ্জ। অথবা ঈমানের কোন একটি রুকন অস্বীকার করা।যেমন আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, তাকদীরের ভালো-মন্দ এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এগুলোর উপর ঈমান আনতেই হবে। এর কোন একটিকে অস্বীকার করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়।

৮. ইসলামী আইনকে ঘৃণা করা :

ইসলামী আইন হলো আল্লাহর বিধান। এর কোন বিধান পুরাতন বা অকেজো হয়ে গেছে মনে করা। এতে ঈমান চলে যায়।

৯. কুরআন-হাদিসের কোন অকাট্য বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা কিংবা ইসলামের কোন অকাট্য হুকুম-আহকাম নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা :

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ (৬৫)لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ

"বল, তোমরা কি আল্লাহ,তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসুলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিলে?(কাজই আজ আমার সামনে) তোমরা কোন ওজর-আপত্তি পেশ করো না। ঈমান আনার পর (বিদ্রুপ করে) পুনরায় তোমরা কুফুরি করেছ।"

(সুরা তাওবা :৬৫-৬৬)

অতএব কুরআন-হাদীস নিয়ে ঠাট্টা করা হলো কুফরী কাজ, যার ফলে ঈমান চলে যায়।

১০.কুরআন-হাদীসের কোন কথা অস্বীকার করা :

জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনুল কারীমের কিংবা খবরের মুতাওয়াতিরের কোন অংশ বা কথা অস্বীকার করলে ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে যায়। যদিও তা কোন ক্ষুদ্র বিষয় হোক না কেন।

১১.আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালি দেয়া :

মহান রবকে গালি দেয়া, দ্বীন ইসলামকে অভিশাপ দেয়া, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়া বা তার কোন অবস্থা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, তার প্রদর্শিত জীবন বিধানের সমালোচনা করা। এ জাতীয় কোন একটি কাজ করলেও কাফির হয়ে যাবে , ঈমান চলে যাবে।

১২. আল্লাহর কোন গুণাবলী অস্বীকার ও অপব্যাখ্যা করা :

আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী রয়েছে। এগুলোর কোন একটিকে অস্বীকার করা অথবা তার কোন কার্যাবলী অস্বীকার করা বা এগুলোর অপব্যাখ্যা করা।

আল্লাহর কোন সিফাত বা নাম যেমন অস্বীকার করা জায়েজ নেই, তেমনি তার কোন গুণবাচক নামের অপব্যাখ্যা করলেও ঈমানহারা হয়ে যাবে।

১৩. কোন একজন নবীকেও অবিশ্বাস বা তুচ্ছ মনে করা :
রাসূলগণকে বিশ্বাস করলেও কোন একজন নবীকে অবিশ্বাস করা অথবা নবী রাসূলদের কোন একজনকে তুচ্ছ মনে করা বা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা।আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِہٖ

"আমরা তার রাসূলগণের মধ্যে কারো ব্যাপারে তারতম্য করি না। " (সুরা বাকারা :২৮৫)

১৪.আল্লাহর আইন অবজ্ঞা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভেবে মানবরচিত আইন দিয়ে বিচার করা :
আর ধারণা করা যে, এ যুগে ইসলামের আইন-কানুন আর চলবে না। এই আইন অনেক পুরাতন হয়ে গেছে। অথবা আল্লাহ প্রদত্ত আইনের বিপরীতে মানবরচিত আইনকে জায়েজ মনে করা এবং আল্লাহর আইনের উপর মানুষের তৈরি আইনকে প্রাধান্য দেয়া।ঈমান ভঙ্গের এটি একটি বড় কারণ।

১৫. ইসলামী বিচারে সন্তুষ্ট না হওয়া :
ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বিচার হলে সেই বিচারে অন্তরে সংকোচ বোধ করা ও কষ্ট পাওয়া। বরং ইসলাম বহির্ভূত আইনের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে স্বস্তি বোধ করা।

১৬. আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক এমন ধরনের আইন তৈরি করা :
এজন্য কোন মানুষকে ক্ষমতা প্রদান করা বা তা সমর্থন করা অথবা ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক এমন ধরনের কোন আইনকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া।

১৭. হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে ফেলা :
যেমন, সুদকে বৈধ ঘোষণা দেয়া বা হালাল মনে করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা বলেন -

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ

"আর আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম।" (সুরা বাকারা ২৭৫)

১৮. আকিদা ধ্বংসাত্মক মতবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা :
যেমন- নাস্তিক্যবাদ,সমাজতন্ত্র, বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি।

১৯. ইসলামের কোন বিধান রদবদল করা বা মুরতাদ হওয়া :

দ্বীনের বিধিবিধান পরিবর্তন করা বা ইসলাম ছেড়ে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যাওয়া।

২০.মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদেরকে সাহায্য করা :

যেকোনো কারণেই হোক মুসলমানদের বিপক্ষে গিয়ে অমুসলিমদের পক্ষালম্বন করা।আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

"মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এইরূপ করবে তার সঙ্গে আল্লাহ্ র কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ্ র দিকেই ফিরে যেতে হবে।"—(আলে ইমরান :২৮)

২১. মুসলিমদেরকে অমুসলিম (কাফের) না ভাবা :

কেননা যারা ঈমান আনেনি আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তাদেরকে কাফির বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে বলেছেন, اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۭ

"নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে সেই কিতাবী ও মুশরিকগণ জাহান্নামের আগুনে যাবে, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।" —(আল বাইয়্যিনাহ :৬)

অর্থাৎ যারা অন্য ধর্মাবলম্বী তারাও সঠিক পথে আছে বলে মনে করা। তাদের ধর্ম ঠিক মনে করা। অথচ কুরআন তাদেরকে কাফের হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।

ঈমান এবং ইসলামের মধ্যে পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক

পূর্বে আমরা ঈমান সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করেছি।এখন আমরা ইসলাম সম্পর্কে কিছু জেনে নেই।

আরবি ভাষায় ইসলাম শব্দটির অর্থ হলো আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া, শান্তির পথে চলা, শরিয়তের হুকুম আহকাম মেনে চলা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর অনুগত হওয়া তার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, বিনা দ্বিধায় আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলা এবং তার

দেওয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করাই হলো ইসলাম। ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, 'ইসলাম হলো তুমি এই কথা সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, হজরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসুল, সালাত আদায় করা, জাকাত প্রদান করা, রমজানের সাওম পালন করা, সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ শরিফ হজ আদায় করা।'

ঈমান ও ইসলাম — উভয়ই ইসলামী পরিভাষার কেন্দ্রীয় দুটি শব্দ। অনেক সময় এদের একে অপরের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনও এদের অর্থগত পার্থক্য দেখা যায়। এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করব, কখন ইসলাম ও ঈমান একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, কখন পৃথক অর্থে, এবং কুরআন-হাদীস ও আকীদাগতভাবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কী।
কুরআনের আলোকে পার্থক্য ও সম্পর্ক :
মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আল-হুজুরাতের ১৪ নং আয়াতে বলেন,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
অর্থ: "বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বলো— তোমরা এখনো ঈমান আনোনি; বরং বলো আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।"

এই আয়াতটি হলো ইসলাম ও ঈমানের পার্থক্য বোঝানোর মৌলিক দলিল।
তাফসির ইবনে কাসিরে বলা হয়েছে, "এই আয়াতে 'ইসলাম' দ্বারা উদ্দেশ্য বাহ্যিক আনুগত্য, আর 'ঈমান' দ্বারা উদ্দেশ্য অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস।"[62]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
অর্থ: "যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম চায়, তা কখনোই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না।"[63]
এখানে ইসলাম বলতে ঈমান-সমেত পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ বোঝানো হয়েছে।
অর্থাৎ যখন একা 'ইসলাম' শব্দটি আসে, তখন তার মধ্যে ঈমানও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

---

[62] ইবনে কাসির, সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৪

[63] সূরা আল-ইমরান: ৮৫

হানাফী- মাতুরিদি আকীদায় পার্থক্য ও সম্পর্ক:

(ক) ঈমান ও ইসলাম পৃথক অবস্থায়: হানাফী–মাতুরিদি মতে, ইসলাম ও ঈমান কখনো পৃথক হয়, আবার কখনো অভিন্ন হয়।যখন ঈমান অন্তরের বিশ্বাস, আর ইসলাম বাহ্যিক আনুগত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন তারা পৃথক।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন:

" الإيمان هو التصديق، والإسلام هو الانقياد والطاعة".

অর্থ: "ঈমান হলো বিশ্বাস স্থাপন করা, আর ইসলাম হলো আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ।"[64]

(খ) একত্রে ব্যবহৃত হলে: যখন একসাথে ব্যবহৃত হয়, তখন ইসলাম ও ঈমান পৃথকার্থক হয়।

কিন্তু যখন পৃথকভাবে আসে, তখন একে অপরের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এ নীতিকে হাদীসবিদগণ বলেন—

" إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا".

অর্থ: "যখন একত্রে আসে, অর্থ পৃথক হয়; আর পৃথকভাবে এলে অর্থ মিলিত হয়।"

এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইমাম আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) ও ইমাম নববী (রহ.) উভয়েই।

দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাশায়েখদের ব্যাখ্যা :

(ক) হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন:

"ঈমান হলো অন্তরের মূল বিশ্বাস, ইসলাম হলো সেই বিশ্বাসের বাহ্যিক প্রকাশ। অন্তরের বিশ্বাস যদি সত্য হয়, তবে বাহ্যিক ইসলাম স্বাভাবিকভাবেই দৃশ্যমান হয়।"[65]

(খ) আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) ব্যাখ্যা করেন:

"ঈমান ও ইসলাম— উভয় শব্দ দুটি পরস্পরের ছায়া। ইসলাম হলো বিশ্বাসের আমলী প্রকাশ, আর ঈমান হলো ইসলামের আধ্যাত্মিক ভিত্তি।"[66]

---

[64] আল- ফিকহুল আকবার

[65] তালিমুদ্দীন

[66] ফায়দুল বারী, ১/৭৮

(গ) মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) তাঁর মা'আরিফুল কুরআন-এ লিখেছেন:

"যেখানে ঈমানের কথা বলা হয়, সেখানে মূলত অন্তরগত স্বীকৃতি বোঝানো হয়; কিন্তু ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হলে তাতে ঈমানসহ সমস্ত আনুগত্যের কর্মসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়।"

জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, ঈমান ও ইসলাম এক অভিন্ন। এ অর্থে যে, দুটিরই লক্ষ্য বিশ্বাস গ্রহণ ও আনুগত্য করা। আর এ অর্থে যে, নাম এবং হুকুমের দিক থেকে সকল মুমিনই মুসলিম ও সকল মুসলিমই মুমিন। এ মতের ওপরই উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ও আল কোরআন ও আল হাদীসের সাক্ষ্য বর্তমান। [67]

এতদপ্রসঙ্গে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলেন : ইসলাম হতে ঈমান পৃথক হয় না। তদ্রুপ ঈমান থেকে ও ইসলাম পৃথক হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলমান সে মুমিনও বটে। আর যে মুমিন সে মুসলিমও। যদিও আভিধানিক অর্থের দিক থেকে ঈমান ও ইসলাম পৃথক পৃথক। যেমন পেট ও পিঠ। পেট ছাড়া পিঠ অথবা পিঠ ছাড়া পেট কল্পনা করা যায় না। যদিও পেট ও পিঠ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। এতদর্থে ঈমান হলো- তাসদীক তথা আন্তরিক বিশ্বাস, আর ইসলাম হলো আনুগত্য। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও তার রাসূল (সা.)-এর প্রতি আন্তরিকব বিশ্বাসী হবে, সে অনুগতও হবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসীও হবে। রাফেযী সম্প্রদায় ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে ঈমান ও ইসলাম একটি হতে অপরটি পৃথক ও আলাদা হতে পারে।[68]

স্মরণ রাখা দরকার যে, এই দুটি সম্প্রদায়ই বাতিল ফিরকার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তাদের অভিমতকে গ্রহণ করা যায় না বা বাতিল।

বস্তুত গভীর মনোযোগের সাথে আল কোরআন ও আল হাদীস অধ্যয়ন করলে ঈমান ও ইসলাম পরস্পর সম্পুরক, তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। এতদপ্রসঙ্গে পবিত্র আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে :

"অনন্তর আমি উক্ত জনবসতি হতে ঈমানদারগণকে বের করলাম। একটি ঘর ব্যতীত মুসলমান কোনো সদস্য পেলাম না।" [69]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

---

[67] শরহুল মাকাসিদ ৩/৪৪২

[68] উসুলুদ্দীন লিল বযদুবী: ৫৫

[69] সূরা যারিয়াত: ৩৫,৩৬

"তোমরা ইসলাম গ্রহণকে আমার জন্য খোটার ব্যাপারে পরিণত করো না, অর্থাৎ তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমার প্রতি করুণা করেছ এমনটি মনে করো না। বরং আল্লাহপাক তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শন করে তোমাদের প্রতি করুণা করেছেন।"[70]

উল্লেখিত আয়াতে কারীমার আলোকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঈমানও ইসলাম পরস্পরে সম্পুরক। এর একটিকে বাদ দিয়েঅন্যটি কল্পনা করা যায় না। আর যায় না বলেই উভয় শব্দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক অভিন্ন।শুধু তাই নয়। আল হাদীসেও এর প্রমাণ বিধৃত আছে। যেমন :

মহানবী হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) জনৈক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে আগত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন : আল্লাহ পাক ও তার রাসূল (সা.)-এর ওপর ঈমান আনয়নের পরিচয় হলো- 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের সিয়াম পালন করা, গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা দেয়া। [71]

উল্লিখিত আয়াতে কারীমা ও আলহাদীসের আলোকে বুঝা যায় সে এখানে ইসলাম বলতে হাকীকতে শরীয়াত তথা ঈমানকে বুঝানো হয়েছে। যদ্বারা ইসলাম ও ঈমান এক হওয়া বুঝা যায়।

[72]

পরিশেষে বলা যায়, ঈমানের আধার হলো অন্তর আর ইসলামের আধার হলো শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ঈমান ব্যতীত ইসলাম ও ইসলাম ব্যতীত ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে প্রকাশ্যে আমলে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ প্রকাশ্যে আমল তথা আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগি আন্তরিক বিশ্বাসে না হলে গ্রহণযোগ্য হয় না। হজরত মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক দেহ ও আত্মার সম্পর্কের মতো। শুধু আমলের নাম ঈমান নয়, অন্যদিকে ঈমানও আমলের নাম নয়। অনেক সময় বিশেষ প্রেক্ষাপটে আমল উঠে যায়। যেমন- ঋতুবতী নারীর সালাত। কিন্তু ওই অবস্থায় ওই মহিলার ঈমান উঠে গেছে একথা বলা যায় না।

---

[70] সূরা হুজুরাত: ১৭

[71] সহীহ বুখারী, ১/১৩

[72] ফাতহুল বারী শরহে বুখারী: ১/৬৬

ঈমানের দৃষ্টিতে মুমিনের মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদাবান করেছেন। যারা ইহকালে ঈমান আনে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে জীবন পরিচালনা করে তাদের জন্য পরকালে চিরস্থায়ী জান্নাতের ব্যবস্থা রেখেছেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, "তারা বলে, আমরা যদি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবলরা (সম্মানীরা) অবশ্যই দুর্বলকে (হীনদের) বহিষ্কার করবে। শক্তি (সম্মান) তো আল্লাহ, তার রাসুল ও মুমিনদেরই; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।"[73]

"মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় পাত্র। আখিরাতে তাদের চিরশান্তির স্থান জান্নাত দান করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাউস জান্নাত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"[74]

মুমিনের সম্মান কাবাঘরের চেয়েও বেশি :

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুল (সা.) কাবাঘর তাওয়াফ করছিলেন। তিনি (কাবাকে লক্ষ্য করে) বলেন, ওহে আল্লাহর ঘর, তুমি কতই পবিত্র এবং তোমার সুঘ্রাণ কতই না মনমাতানো! তুমি কতই না মর্যাদাবান, কত সম্মানের অধিকারী! নিশ্চয়ই সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ! একজন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তোমার চেয়েও অধিক মর্যাদাবান, তাদের মাল ও রক্ত। এ জন্য আমরা মুমিনদের ব্যাপারে সর্বদা সুধারণা পোষণ করি। [75]

মুমিনের সম্মান ফেরেশতার চেয়েও বেশি :

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' করে সৃষ্টি করেছেন। আদম সন্তানকে তিনি অন্যান্য সৃষ্টি জীবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদের স্থলে ও জলে চলাচলের

[73] সূরা মুনাফিকুন: ৮

[74] সূরা কাহাফ: ১০৭-১০৮

[75] ইবনে মাজাহ, ২/১৮৩০

জন্য বাহন দান করেছি। তাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং তাদের অনেক সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। [76]
ফেরেশতা, জিন, মানব ইত্যাদি আল্লাহর সৃষ্টি।

জিনজাতির চেয়ে মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশি:
আদম সন্তানের মধ্যে যারা পরিপূর্ণ মুমিন ওলি-আউলিয়া তাদের মর্যাদা সাধারণ ফেরেশতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর নবী-রাসুলগণ হলেন মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতা তথা জিবরাইল (আ.), মিকাইল (আ.), ইসরাফিল (আ.) ও আজরাইল (আ.)-এর চেয়েও বেশি মর্যাদাবান। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে আবেদন করলেন যে হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি মানবজাতিকে দুনিয়া দান করেছেন, তারা পানাহার করে, বস্ত্র পরিধান করে আর আমরা সদাসর্বদা আপনার প্রশংসা করি ও তাসবিহ পাঠ করি। আমরা পানাহার করি না কৌতুকও করি না। তাই মানবজাতিকে যেভাবে দুনিয়া দান করেছেন তেমনিভাবে আমাদের আখিরাত দান করুন। আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তরে বলেন, যাদের আমি কুদরতি হাতে সৃষ্টি করেছি তাদের সমতুল্য এমন কাউকে করব না, যাদের আমি 'কুন' (হও) শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (আল মুজামুল আউসাত: ৭/৯৯)

ঈমান ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না

ইসলামের দৃষ্টিতে জান্নাতে প্রবেশের প্রথম ও মৌলিক শর্ত হলো ঈমান। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁর নির্ধারিত আকীদার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা ছাড়া কারো জন্য জান্নাত প্রাপ্য নয়। ঈমান মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করায়, তার অন্তরে তাওহীদের জ্যোতি জাগায় এবং তাকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতি বাধ্য করে। ফলে কোনো মানুষ যদি ঈমান গ্রহণ না করে বা ঈমানের মৌলিক রুকনসমূহ অস্বীকার করে, তবে তার সকল সৎকর্ম আখিরাতে কোনো মূল্য রাখে না।

কুরআনে আল্লাহ বলেন, "যে ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী।" এর দ্বারা বোঝা যায়, ঈমান হলো জান্নাতপ্রাপ্তির মূল ভিত্তি; এটি ছাড়া আমল গ্রহণযোগ্য হয় না এবং আখিরাতে মুক্তিও পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বহু হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে

[76] সুরা বনী-ইসরাঈল : ৭০

ঈমান ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, কারণ ঈমান মানুষকে শিরক, কুফর, নাস্তিকতা ও অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং তাকে আল্লাহর রহমতের যোগ্য করে।

তাছাড়া ঈমান মানুষকে নৈতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ঈমানপূর্ণ হৃদয় কখনো আল্লাহর অবাধ্যতার পথে চলে না, বরং সৎপথে অটল থাকার চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি ঈমানহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না এবং আখিরাতে জান্নাত লাভের অধিকারী হয় না।

অতএব, ঈমান শুধু মুখের স্বীকারোক্তি নয়; বরং হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, মুখের সাক্ষ্য এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ একটি আকীদা। আল্লাহর সন্তুষ্টি, দুনিয়ার শান্তি এবং আখিরাতের মুক্তি—সবই ঈমানের উপর নির্ভরশীল। তাই ঈমান ছাড়া জান্নাতের দরজা কখনো খুলে না; কারণ জান্নাত আল্লাহর অনুগ্রহ, আর সেই অনুগ্রহের প্রথম শর্তই হলো প্রকৃত ঈমান।

ঈমানদার গুনাহগার হলে জান্নাত লাভ করবে কি?

ইহকালীন জীবনে মানুষের কৃতকর্মের মাধ্যমে অর্জিত নেকী পরকালীন জীবনে পরিত্রাণ লাভের উসিলা হবে। তাই দুনিয়াতে অধিক নেক আমলের দ্বারা বেশি বেশি ছওয়াব লাভের চেষ্টা করা মুমিনের কর্তব্য। কিন্তু পার্থিব জীবনের মায়াময়তায় জড়িয়ে আমলে ছালেহ থেকে দূরে থাকলে পরকালীন জীবনে কষ্টভোগ করতে হবে। এজন্য রাসূল (সা.) বলেন, حُلْوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الآخِرَةِ وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حُلْوَةُ الآخِرَة- ‘পৃথিবীর মিষ্টতা পরকালের তিক্ততা। আর পৃথিবীর তিক্ততা পরকালের মিষ্টতা’। তাই পরকালীন জীবনে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে গোনাহ পরিহার করতে হবে এবং অফুরন্ত নেয়ামত সমৃদ্ধ অমূল্য জান্নাত লাভে নেক আমল করতে হবে।রাসূল (সা.) বলেন, مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّة ‘যে ব্যক্তি ভয় করেছে, সে পালিয়েছে। আর যে পালিয়েছে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছে। জেনে রাখ আল্লাহর সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান, জেনে রাখ আল্লাহর সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান’। জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রত্যাশী ও জান্নাত লাভে আকাঙ্ক্ষী মুমিন সারারাত ঘুমিয়ে কাটাতে পারে না। এজন্য রাসূল (সা.) বলেন, مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا ‘আমি জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী ব্যক্তিকে কখনো ঘুমাতে দেখিনি, আর জান্নাত অন্বেষণকারীকেও কখনো ঘুমাতে দেখিনি’। তাই জান্নাত লাভের জন্য নেকীর কাজ বেশি

বেশি করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।ঈমান গ্রহণ করা মানুষের বুনিয়াদি ফরজ। যার ঈমান নেই তার কোনো আমলই কবুল হয় না। যার ঈমান সহিহ নয়, তার আমলও গ্রহণযোগ্য নয়। রূহ ছাড়া দেহের যেমন দাম নেই; তেমনি ঈমান ছাড়া আমলের কোনো দাম নেই। কিন্তু ঈমান গ্রহণকারী পাপীরা কি জান্নাতে যাবে?মানুষ ভাল কাজের প্রতিফল তখনই পাবে যখন ঈমানের সঙ্গে ভাল কাজ করবে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকে ঘোষণা করেছেন- "যারা (প্রথমত) ঈমান আনে এবং (দ্বিতীয়ত) নেক আমল করে; তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস।"[77]

ঈমানবিহীন আমলের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, 'যারা কাফের (যাদের ঈমান ঠিক নেই) তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরিচীকার ন্যায়।' [78]

তাই আমলের গ্রহণযোগ্যতার জন্য ঈমানের বিকল্প নেই। মানুষ পরকালে ঈমান ছাড়া কোনো আমলেরই সাওয়াব পাবে না।যারা ঈমানের স্বাদ পেয়েছে তারাই সফলকাম। ঈমান গ্রহণের ফলে মানুষ দুনিয়া ও পরকালের শান্তি লাভ করে। আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারার শুরুতে পরহেজগার বা আল্লাহ ভিরু মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে ঈমানদার সম্বোধন করেছেন।আর যারা ঈমান লাভ করেছে তাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে যে, 'ঈমানদাররাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েত বা সুপথ প্রাপ্ত। আর তারাই সফলকাম। অর্থাৎ ঈমানদার বান্দা দুনিয়াতেও সফলকাম। পরকালেও সফলকাম।হজরত আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে (ব্যক্তি) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, আর এর উপর তার মৃত্যু হবে সে জান্নাতে যাবে।'মানুষের ঈমান গ্রহণের বুনিয়াদি বাক্যই হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে এ বাক্য পড়ে ঈমান গ্রহণ করবে সে ব্যক্তিই ঈমানদার। তারপর সে ইসলামের অন্যান্য বিষয়াদি যথাযথ পালন করবে। ঈমান গ্রহণের পর ঈমানদারের জন্য ইসলামের অনুষাঙ্গিক আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ পালন করা সহজ হয়ে যায়। আর এর বিনিময়ে লাভ করবে চিরস্থায়ী জান্নাত।মানুষ ভুল করবে, গুনাহ করবে; আবার আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর পথে ফিরে আসবে; আল্লাহ তাঁর দিকে ফিরে আসা ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিবেন। এটা আল্লাহর ঘোষণা।যখনই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি মানুষের ঈমান থাকবে; তখন মানুষ গুনাহগার হলেও একটা সময় জান্নাত লাভ করবে। ঈমান ও ভালো কাজের জন্য ওই ব্যক্তির জান্নাত সুনিশ্চিত। তাঁর ভাল কাজের বিনিময় সে পাবে। কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন যে, ঈমানদার জান্নাতে যাবে।'যদি তার পাপও থাকে; তবুও সে জান্নাতে যাবে। তবে তাকে পাপ

[77] সূরা কাহাফ: ১০৭

[78] সূরা নূর: ৩৯

পরিমাণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন তবে পাপী ব্যক্তিকেও কোনো না কোনো ওসিলায় মাফ করে দিতে পারেন। এটা আল্লাহ তাআলার ইখতিয়ার।উপরন্তু যার ঈমান-ই নেই; তাঁর কোনো ভাল কাজই গ্রহণ যোগ্য হবে না। আর শাস্তি ভোগের পরে জান্নাতে যাওয়ারও কোনো সুযোগ তার জন্য নেই। ঈমানবিহীন ব্যক্তির জন্য রয়েছে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি।

ঈমান সংরক্ষণের উপায়

ঈমান মুমিনের জীবনের মূল চালিকাশক্তি। এটি দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের একমাত্র ভিত্তি। কিন্তু ঈমান একটি স্থির বিষয় নয়; বরং এটি বাড়ে ও কমে। তাই ঈমানকে সুরক্ষিত, শক্তিশালী ও স্থায়ী রাখতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা জরুরি। নিচে ঈমান সংরক্ষণের প্রধান উপায়সমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো—

১. সঠিক আকীদার জ্ঞান অর্জন ও দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা:

ঈমান সংরক্ষণের সর্বপ্রথম শর্ত হলো ঈমানের মূল কাঠামো—তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, ফেরেশতা, কিতাব এবং তাকদীর বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন। জ্ঞানহীনতা ঈমানকে দুর্বল করে এবং বিভ্রান্ত চিন্তা ও কুসংস্কারের দিকে ঠেলে দেয়। তাই কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে সালেহিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আকীদা শেখা এবং ভুল বিশ্বাস থেকে দূরে থাকা ঈমানকে স্থায়ী করে।

২. কুরআন তিলাওয়াত, তাদাব্বুর ও কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন:

কুরআন ঈমানের আলো বৃদ্ধি করার প্রধান উৎস। নিয়মিত তিলাওয়াত, অনুবাদ বোঝা, আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং জীবনে তার শিক্ষা বাস্তবায়ন করলে ঈমান সর্বদা নির্মল থাকে। কুরআনের প্রতিটি আয়াত মুমিনের হৃদয়ে ভয়, আশা, ভালোবাসা ও আল্লাহ-সচেতনতা জাগ্রত করে—যা ঈমান সংরক্ষণে অপরিহার্য।

৩. নিয়মিত নামাজ ও অন্যান্য ইবাদতে অটল থাকা:

নামাজ ঈমানের বাহ্যিক ও দৃশ্যমান প্রমাণ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শুধু আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে দৃঢ় করে না, বরং হৃদয়কে পবিত্র করে, অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বিরত রাখে। পাশাপাশি রোজা, যাকাত, হজ্জ, নফল ইবাদত, তাহাজ্জুদ ও দোয়া—সবই ঈমানের মূল ভিত্তিকে শক্ত করে এবং মুমিনকে আল্লাহর নৈকট্যের পথে পরিচালিত করে।

৪. গুনাহ ও পাপ থেকে কঠোরভাবে দূরে থাকা:

গুনাহ ঈমানকে ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং হৃদয়ের উপর কালিমা সৃষ্টি করে। নিয়মিত পাপ অবশেষে ঈমানকে দুর্বল করে দেয়। তাই বড় পাপ থেকে বেঁচে থাকা, ছোট পাপকে অবহেলা না করা এবং কোনো ভুল হয়ে গেলে সাথে সাথে তওবা করা ঈমান রক্ষার অন্যতম উপায়। তওবা ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং মানুষকে শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখে।

৫. সৎ ও নেক মানুষের সহচর্য লাভ:

ভালো সঙ্গ মানুষকে নেকের দিকে আহ্বান করে, আর খারাপ সঙ্গ তাকে গুনাহ ও বিপথে নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) সঙ্গের গুরুত্ব তুলনা করেছেন সুগন্ধ বিক্রেতা ও লোহার কামারের সাথে। তাই দ্বীনদার, নৈতিক ও সৎ মানুষের সঙ্গ ঈমানকে সঠিক পথে রাখে এবং খারাপ পরিবেশ থেকে দূরে থাকা ঈমান সংরক্ষণে অপরিহার্য।

৬. আল্লাহর স্মরণ, যিকর এবং দোয়া-ইস্তেগফারে স্থির থাকা:

যিকর হৃদয়ের রোগ সারায় এবং ঈমানকে জীবন্ত রাখে। নিয়মিত "সুবহানাল্লাহ", "আলহামদুলিল্লাহ", "আল্লাহু আকবার", "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", ইস্তেগফার, দোয়া ও মুনাজাত—এসবের মাধ্যমে হৃদয় নরম হয় এবং ঈমান নবায়িত হয়। যিকর মানুষকে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে শিখায়, যা ঈমানের শক্তির মূল উৎস।

৭. সৎকর্মে অবিচলতা ও চরিত্রের উন্নতি:

সৎকর্ম ঈমানকে বৃদ্ধি করে এবং মানুষের চরিত্রে পরিবর্তন আনে। সত্যবাদিতা, amanah পালন, দয়া, নম্রতা, পরহেজগারি, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা—এসব ইসলামী নৈতিকতা ঈমানকে দৃঢ় করে। মন্দ ও কপটতা ঈমানকে দুর্বল করে। তাই উত্তম চরিত্র গঠন ঈমান সংরক্ষণের অংশ।

৮. আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির (মুহাসাবা) চর্চা:

মুমিন প্রতিদিন নিজের আমল পর্যালোচনা করে, ভুল-ত্রুটি শনাক্ত করে এবং সংশোধনের চেষ্টা করে। আত্মশুদ্ধি না থাকলে ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই নিয়মিত নিজের অন্তর বিশুদ্ধ করা, নিয়ত ঠিক করা এবং গোপনে-প্রকাশ্যে আমল পর্যালোচনা ঈমানকে শক্তিশালী রাখে।

৯. দ্বীন শেখা ও অন্যকে শেখানোর আমল:

ইসলাম শেখা এবং তা অন্যকে শেখানো মুমিনের ঈমানকে দৃঢ় করে। জ্ঞান ছড়িয়ে দিলে নিজের ঈমানও বৃদ্ধি পায়। কারণ জ্ঞানের আলো মানুষকে ভুল পথ থেকে রক্ষা করে এবং তাকে আল্লাহর জ্ঞান ও মহত্ত্ব অনুভব করায়।
১০. আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল, রিদা ও সবর:

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা রাখা, তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা এবং কষ্টের সময়ে ধৈর্য ধারণ করা ঈমানের দৃঢ়তার প্রমাণ। যে ব্যক্তির তাওয়াক্কুল দৃঢ়, তার ঈমান কখনো ভেঙে পড়ে না; বরং পরীক্ষার মধ্যেও সে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সঠিক পথে অটল থাকে।

১১. দুনিয়ার মোহ কমানো ও আখিরাতমুখী জীবন গঠন:

দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত মোহ ও ভোগবাদ ঈমানকে দুর্বল করে দেয়। তাই দুনিয়াকে সাময়িক মনে করা, আখিরাতকে উদ্দেশ্য করা এবং জীবনের লক্ষ্যকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করা ঈমান সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১২. শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার থেকে দূরে থাকা:

শিরক ঈমান ধ্বংস করে, আর বিদআত ও কুসংস্কার ঈমানকে বিকৃত করে। তাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া কোনো বাড়তি ধর্মীয় আচরণ কিংবা মিথ্যা বিশ্বাস অনুসরণ ঈমানের জন্য হুমকি। বিশুদ্ধ আকীদা ধরে রাখা ঈমান রক্ষার মূল উপায়।

সুতরাং ঈমান সংরক্ষণ একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া—যা জ্ঞান, ইবাদত, সৎকর্ম, আত্মসমালোচনা এবং সৎ সঙ্গের সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়। এই উপায়গুলো অনুসরণ করলে এক মুমিনের ঈমান শুধু সংরক্ষিতই থাকে না, বরং সময়ের সঙ্গে আরও দৃঢ় ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পরিসমাপ্তি

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামে ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ, তার অপরিহার্যতা, মূল রুকনসমূহ এবং ঈমানভঙ্গের কারণসমূহকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা। আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়েছে যে ঈমান শুধু ইসলামী জীবনের ভিত্তি নয়, বরং মানবজীবনের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক উৎকর্ষতার কেন্দ্রবিন্দু। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) যে ঈমানের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন, তা স্বীকৃতি না দিলে কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হয় না এবং আখিরাতেও মুক্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। ফলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈমানকে দৃঢ় রাখা, শিরক-কুফর থেকে দূরে থাকা এবং আচার-আচরণে ঈমানের প্রতিফলন ঘটানো প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।

গবেষণায় আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, ঈমান স্থির নয়; বরং তা বাড়ে ও কমে—অনুসরণীয় কাজের মাধ্যমে সুদৃঢ় হয় এবং গোনাহের মাধ্যমে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই ঈমান রক্ষার জন্য নিরন্তর আত্মশুদ্ধি, জ্ঞান অর্জন, আল্লাহ-ভীতি এবং সৎকর্মের প্রতি অবিচলতা প্রয়োজন। একইসাথে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় রোধ, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়-ইনসাফভিত্তিক জীবন গঠনের মূল চাবিকাঠিও হল ঈমান।

অতএব, বলা যায়—ঈমান শুধু ইসলামের কেন্দ্রীয় আকীদা নয়; বরং মানবতার পুনর্জাগরণ, আত্ম-উন্নয়ন এবং চিরস্থায়ী পরকালের সাফল্যের মূলে অবস্থান করে। মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক উন্নতি, ঐক্য ও মুক্তির পথ ঈমান দৃঢ় করার মধ্যেই নিহিত। এই গবেষণা তাই ঈমান সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।